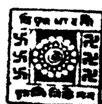
রাজর্ষি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট । কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ ১২৯৩

দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩০৬

বিশ্বভারতী কর্তৃক তৃতীয় সংস্করণ ১৩৩১

পুনর্মুদ্রণ ১৩৩৮, ১৩৪০, ১৩৪৪

রবীন্দ্র-রচনাবলী সংস্করণ ১৩৪৬, ১৩৪৭

পুনর্মুদ্রণ চৈত্র ১৩৪৭, শ্রাবণ ১৩৫১, অগ্রহায়ণ ১৩৫২

পৌষ ১৩৫৪, মাঘ ১৩৫৮, অগ্রহায়ণ ১৩৬১, বৈশাখ ১৩৬৫

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬, বৈশাখ ১৩৬৭, বৈশাখ ১৩৬৮

পৌষ ১৩৬৮ : ১৮৮৩ শকাব্দ

রাজর্ষি

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভুবনেশ্বরী-মন্দিরের পাথরের ঘাট গোমতী নদীতে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য একদিন গ্রীষ্মকালের প্রভাতে স্নান করিতে আসিয়াছেন, সঙ্গে তাঁহার ভাই নক্ষত্ররায়ও আসিয়াছেন। এমন সময়ে একটি ছোটো মেয়ে তাহার ছোটো ভাইকে সঙ্গে করিয়া সেই ঘাটে আসিল। রাজার কাপড় টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ?"

রাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "মা, আমি তোমার সন্তান।"

মেয়েটি বলিল, "আমাকে পূজার ফুল পাড়িয়া দাও-না।"

রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, চলো।"

অনুচরগণ অস্থির হইয়া উঠিল। তাহারা বলিল, "মহারাজ, আপনি কেন যাইবেন, আমরা পাড়িয়া দিতেছি।"

রাজা বলিলেন, "না, আমাকে যখন বলিয়াছে আমিই পাড়িয়া দিব।"

রাজা সেই মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। (সেদিনকার বিমল উষার সঙ্গে তাহার মুখের সাদৃশ্য ছিল।) রাজার হাত ধরিয়া যখন সে মন্দিরসংলগ্ন ফুলবাগানে বেড়াইতেছিল তখন চারি দিকের শুভ্র বেলফুলগুলির মতো তাহার ফুট্‌ফুটে মুখখানি হইতে যেন একটি বিমল সৌরভের ভাব উত্থিত হইয়া প্রভাতের কাননে ব্যাপ্ত হইতেছিল। ছোটো ভাইটি দিদির কাপড় ধরিয়া দিদির সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছিল। সে কেবল একমাত্র দিদিকেই জানে, রাজার সঙ্গে তাহার বড়ো একটা ভাব হইল না।

রাজা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী, মা ?"

মেয়ে বলিল, "হাসি।"

রাজা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী?"

ছেলেটি বড়ো বড়ো চোখ মেলিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিছু উত্তর করিল না।

হাসি তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিল, "বল্-না ভাই, আমার নাম তাতা।"

ছেলেটি তাহার অতি ছোটো দুইখানি ঠোঁট একটুখানি খুলিয়া গম্ভীরভাবে দিদির কথার প্রতিধ্বনির মতো বলিল, "আমার নাম তাতা।" বলিয়া দিদির কাপড় আরও শক্ত করিয়া ধরিল।

হাসি রাজাকে বুঝাইয়া বলিল, "ও কিনা ছেলেমানুষ, তাই ওকে সকলে তাতা বলে।" ছোটো ভাইটির দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "আচ্ছা, বল্ দেখি মন্দির।"

ছেলেটি দিদির দিকে চাহিয়া কহিল, "লদন্দ।"

হাসি হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তাতা মন্দির বলিতে পারে না, বলে লদন্দ—আচ্ছা, বল্ দেখি কড়াই।"

ছেলেটি গম্ভীর হইয়া বলিল, "বলাই।"

হাসি আবার হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তাতা আমাদের কড়াই বলিতে পারে না, বলে বলাই!" বলিয়া তাতাকে ধরিয়া চুমো খাইয়া খাইয়া অস্থির করিয়া দিল।

তাতা সহসা দিদির এত হাসি ও এত আদরের কোনোই কারণ খুঁজিয়া পাইল না, সে কেবল মস্ত চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল। বাস্তবিকই মন্দির এবং কড়াই শব্দ উচ্চারণ সম্বন্ধে তাহার সম্পূর্ণ ত্রুটি ছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। তাতার বয়সে হাসি মন্দিরকে কখনোই লদন্দ বলিত না, সে মন্দিরকে বলিত পালু; আর সে কড়াইকে বলাই বলিত কি না জানি না, কিন্তু কড়িকে বলিত ঘয়ি; সুতরাং তাতার এরূপ বিচিত্র উচ্চারণ শুনিয়া তাহার যে অত্যন্ত হাসি পাইবে তাহাতে

আর আশ্চর্য কী? তাতা সম্বন্ধে নানা ঘটনা সে রাজাকে বলিতে লাগিল। একবার একজন বুড়োমানুষ কম্বল জড়াইয়া আসিয়াছিল, তাতা তাহাকে ভাল্লুক বলিয়াছিল, এমনি তাতার মন্দ বুদ্ধি। আর একবার তাতা গাছের আতাফলগুলিকে পাখি মনে করিয়া মোটা মোটা ছোটো দুটি হাতে তালি দিয়া তাহাদিগকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাতা যে হাসির চেয়ে অনেক ছেলেমানুষ, ইহা তাতার দিদি বিস্তর উদাহরণদ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিয়া দিল। তাতা নিজের বুদ্ধির পরিচয়ের কথা সম্পূর্ণ অবিচলিতচিত্তে শুনিতেছিল, যতটুকু বুঝিতে পারিল তাহাতে ক্ষোভের কারণ কিছুই দেখিতে পাইল না। এইরূপে সেদিনকার সকালে ফুল-তোলা শেষ হইল। (ছোটো মেয়েটির আঁচল ভরিয়া যখন ফুল দিলেন তখন রাজার মনে হইল, যেন তাঁহার পূজা শেষ হইল;) এই দুইটি সরল প্রাণের স্নেহের দৃশ্য দেখিয়া, এই পবিত্র হৃদয়ের আশ মিটাইয়া ফুল তুলিয়া দিয়া তাঁহার যেন দেবপূজার কাজ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিন হইতে ঘুম ভাঙিলে সূর্য উঠিলেও রাজার প্রভাত হইত না, ছোটো দুটি ভাইবোনের মুখ দেখিলে তবে তাঁহার প্রভাত হইত। প্রতিদিন তাহাদিগকে ফুল তুলিয়া দিয়া তবে তিনি স্নান করিতেন; দুই ভাইবোনে ঘাটে বসিয়া তাঁহার স্নান দেখিত। যেদিন সকালে এই দুটি ছেলেমেয়ে না আসিত সেদিন তাঁহার সন্ধ্যা-আহ্নিক যেন সম্পূর্ণ হইত না।

হাসি ও তাতার বাপ মা কেহ নাই। কেবল একটি কাকা আছে। কাকার নাম কেদারেশ্বর। এই দুটি ছেলেমেয়েই তাহার জীবনের একমাত্র সুখ ও সম্বল।

এক বৎসর কাটিয়া গেল। তাতা এখন মন্দির বলিতে পারে, কিন্তু

এখনও কড়াই বলিতে বলাই বলে। অধিক কথা সে কয় না। গোমতী নদীর ধারে নাগকেশর গাছের তলায় পা ছড়াইয়া তাহার দিদি তাহাকে যে-কোনো গল্পই বলিত সে তাহাই ড্যাবাড্যাবা চোখে অবাক হইয়া শুনিত। সে গল্পের কোনো মাথামুণ্ড ছিল না। কিন্তু সে যে কী বুঝিত সেই জানে; গল্প শুনিয়া সেই গাছের তলায়, সেই সূর্যের আলোতে, সেই মুক্ত সমীরণে একটি ছোটো ছেলের ছোটো হৃদয়টুকুতে যে কত কথা কত ছবি উঠিত তাহা আমরা কী জানি। তাতা আর-কোনো ছেলের সঙ্গে খেলা করিত না, কেবল তাহার দিদির সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো বেড়াইত।

আষাঢ় মাস। সকাল হইতে ঘন মেঘ করিয়া রহিয়াছে। এখনও বৃষ্টি পড়ে নাই, কিন্তু বাদলা হইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। দূর-দেশের বৃষ্টির কণা বহিয়া শীতল বাতাস বহিতেছে। গোমতী নদীর জলে এবং গোমতী নদীর উভয় পারের অরণ্যে অন্ধকার আকাশের ছায়া পড়িয়াছে। কাল রাত্রে অমাবস্যা ছিল, কাল ভুবনেশ্বরীর পূজা হইয়া গিয়াছে।

যথাসময়ে হাসি ও তাতার হাত ধরিয়া রাজা স্নান করিতে আসিয়াছেন। একটি রক্তস্রোতের রেখা শ্বেতপ্রস্তরের ঘাটের সোপান বাহিয়া জলে গিয়া শেষ হইয়াছে। কাল রাত্রে যে এক-শো-এক মহিষ বলি হইয়াছে তাহারই রক্ত।

হাসি সেই রক্তের রেখা দেখিয়া সহসা একপ্রকার সংকোচে সরিয়া গিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কিসের দাগ, বাবা?"

রাজা বলিলেন, "রক্তের দাগ, মা।"

সে কহিল, "এত রক্ত কেন?"

এমন একপ্রকার কাতর স্বরে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল 'এত রক্ত কেন' যে, রাজারও হৃদয়ের মধ্যে ক্রমাগত এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল

'এত রক্ত কেন'। তিনি সহসা শিহরিয়া উঠিলেন।

(বহুদিন ধরিয়া প্রতিবৎসর রক্তের স্রোত দেখিয়া আসিতেছেন, একটি ছোটো মেয়ের প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল 'এত রক্ত কেন'।) তিনি উত্তর দিতে ভুলিয়া গেলেন। অন্যমনে স্নান করিতে করিতে ঐ প্রশ্নই ভাবিতে লাগিলেন।

হাসি জলে আঁচল ভিজাইয়া সিঁড়িতে বসিয়া ধীরে ধীরে রক্তের রেখা মুছিতে লাগিল, তাহার দেখাদেখি ছোটো হাতদুটি দিয়া তাতাও তাহাই করিতে লাগিল। হাসির আঁচলখানি রক্তে লাল হইয়া গেল। রাজার যখন স্নান হইয়া গেল তখন দুই ভাইবোনে মিলিয়া রক্তের দাগ মুছিয়া ফেলিয়াছে।

সেইদিন বাড়ি ফিরিয়া গিয়া হাসির জ্বর হইল। তাতা কাছে বসিয়া দুটি ছোটো আঙুলে দিদির মুদ্রিত চোখের পাতা খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া মাঝে মাঝে ডাকিতেছে, "দিদি।" দিদি অমনি সচকিতে একটুখানি জাগিয়া উঠিতেছে। "কী তাতা" বলিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইতেছে, আবার তাহার চোখ ঢুলিয়া পড়িতেছে। তাতা অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, কোনো কথাই বলে না। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে দিদির গলা জড়াইয়া দিদির মুখের কাছে মুখ দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "দিদি, তুই উঠবি নে?" হাসি চমকিয়া জাগিয়া তাতাকে বুকে চাপিয়া কহিল, "কেন উঠব না, ধন!" কিন্তু দিদির উঠিবার আর সাধ্য নাই। তাতার ক্ষুদ্র হৃদয় যেন অত্যন্ত অন্ধকার হইয়া গেল; তাতার সমস্ত দিনের খেলাধুলা আনন্দের আশা একেবারে ম্লান হইয়া গেল। আকাশ অত্যন্ত অন্ধকার, ঘরের চালের উপর ক্রমাগতই বৃষ্টির শব্দ শুনা যাইতেছে, প্রাঙ্গণের তেঁতুল গাছ জলে ভিজিতেছে, পথে পথিক নাই। কেদারেশ্বর একজন বৈদ্যকে সঙ্গে করিয়া আনিল। বৈদ্য নাড়ী টিপিয়া

অবস্থা দেখিয়া ভালো বোধ করিল না।

তাহার পরদিন স্নান করিতে আসিয়া রাজা দেখিলেন, মন্দিরে দুইটি ভাইবোন তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া নাই। মনে করিলেন, এই ঘোরতর বর্ষায় তাহারা আসিতে পারে নাই। স্নান-তর্পণ শেষ করিয়া শিবিকায় চড়িয়া বাহকদিগকে কেদারেশ্বরের কুটিরে যাইতে আজ্ঞা দিলেন। অনুচরেরা সকলে আশ্চর্য হইয়া গেল, কিন্তু রাজাজ্ঞার উপরে আর কথা কহিতে পারিল না।

রাজার শিবিকা প্রাঙ্গণে গিয়া পৌঁছিলে কুটিরে অত্যন্ত গোলযোগ পড়িয়া গেল। সে গোলমালে রোগীর রোগের কথা সকলেই ভুলিয়া গেল। কেবল তাতা নড়িল না, সে অচেতন দিদির কোলের কাছে বসিয়া দিদির কাপড়ের এক প্রান্ত মুখের ভিতর পুরিয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

রাজাকে ঘরে আসিতে দেখিয়া তাতা জিজ্ঞাসা করিল, "কী হয়েছে?"

উদ্‌বিগ্নহৃদয় রাজা কিছুই উত্তর দিলেন না। তাতা ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "দিদির নেগেছে?"

খুড়ো কেদারেশ্বর কিছু বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল, "হাঁ, লেগেছে।"

অমনি তাতা দিদির কাছে গিয়া দিদির মুখ তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া গলা জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, তোমার কোথায় নেগেছে?" মনের অভিপ্রায় এই যে, সেই জায়গাটাতে ফুঁ দিয়া, হাত বুলাইয়া দিদির সমস্ত বেদনা দূর করিয়া দিবে। কিন্তু যখন দিদি কোনো উত্তর দিল না, তখন তাহার আর সহ্য হইল না— ছোটো দুটি ঠোঁট উত্তরোত্তর ফুলিতে লাগিল, অভিমানে কাঁদিয়া উঠিল। কাল হইতে বসিয়া আছে, একটি কথা নাই কেন? তাতা কী করিয়াছে যে তাহার উপর এত অনাদর? রাজার সম্মুখে তাতার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া

কেদারেশ্বর অত্যন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে বিরক্ত হইয়া তাতার হাত ধরিয়া অন্য ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। তবুও দিদি কিছু বলিল না।

রাজবৈদ্য আসিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়া গেল। রাজা সন্ধ্যাবেলায় আবার হাসিকে দেখিতে আসিলেন। তখন বালিকা প্রলাপ বকিতেছে। বলিতেছে, "মা গো, এত রক্ত কেন!"

রাজা কহিলেন, "মা, এ রক্তস্রোত আমি নিবারণ করিব।"

বালিকা বলিল, "আয় ভাই তাতা, আমরা দুজনে এ রক্ত মুছে ফেলি।"

রাজা কহিলেন, "আয় মা, আমিও মুছি।"

সন্ধ্যার কিছু পরেই হাসি একবার চোখ খুলিয়াছিল। একবার চারি দিকে চাহিয়া কাহাকে যেন খুঁজিল। তখন তাতা অন্য ঘরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কাহাকে যেন না দেখিতে পাইয়া হাসি চোখ বুজিল। চক্ষু আর খুলিল না। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রাজার কোলে হাসির মৃত্যু হইল।

হাসিকে যখন চিরদিনের জন্য কুটির হইতে লইয়া গেল তখন তাতা অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইতেছিল। সে যদি জানিতে পাইত তবে সেও বুঝি দিদির সঙ্গে সঙ্গে ছোটো ছায়াটির মতো চলিয়া যাইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজার সভা বসিয়াছে। ভুবনেশ্বরী-দেবী-মন্দিরের পুরোহিত কার্যবশতঃ রাজদর্শনে আসিয়াছেন।

পুরোহিতের নাম রঘুপতি। এ দেশে পুরোহিতকে চোন্তাই বলিয়া থাকে। ভুবনেশ্বরী দেবীর পূজার চৌদ্দ দিন পরে গভীর রাত্রে চতুর্দশ-দেবতার এক পূজা হয়। এই পূজার সময় এক দিন দুই রাত্রি কেহ ঘরের বাহির হইতে পারে না, রাজাও না। রাজা যদি বাহির হন, তবে

চোন্তাইয়ের নিকটে তাঁহাকে অর্থদণ্ড দিতে হয়। প্রবাদ আছে, এই পূজার রাত্রে মন্দিরে নরবলি হয়। এই পূজা-উপলক্ষে সর্বপ্রথমে যে-সকল পশু বলি হয় তাহা রাজবাড়ির দান বলিয়া গৃহীত হয়। এই বলির পশু গ্রহণ করিবার জন্য চোন্তাই রাজসমীপে আসিয়াছেন। পূজার আর বারো দিন বাকি আছে।

রাজা বলিলেন,"এ বৎসর হইতে মন্দিরে জীববলি আর হইবে না।"

সভাসুদ্ধ লোক অবাক্ হইয়া গেল। রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়ের মাথার চুল পর্যন্ত দাঁড়াইয়া উঠিল।

চোন্তাই রঘুপতি বলিলেন, "আমি এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি!"

রাজা বলিলেন, "না ঠাকুর, এতদিন আমরা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, আজ আমাদের চেতনা হইয়াছে। একটি বালিকার মূর্তি ধরিয়া মা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, করুণাময়ী জননী হইয়া মা তাঁহার জীবের রক্ত আর দেখিতে পারেন না।"

রঘুপতি কহিলেন, "মা তবে এত দিন ধরিয়া জীবের রক্ত পান করিয়া আসিয়াছেন কী করিয়া?"

রাজা কহিলেন, "না, পান করেন নাই। তোমরা যখন রক্তপাত করিতে তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া থাকিতেন।"

রঘুপতি বলিলেন, "মহারাজ, রাজকার্য আপনি ভালো বুঝেন সন্দেহ নাই, কিন্তু পূজা সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না। দেবীর যদি কিছুতে অসন্তোষ হইত আমিই আগে জানিতে পারিতাম।"

নক্ষত্ররায় অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "হাঁ, এ ঠিক কথা। দেবীর যদি কিছুতে অসন্তোষ হইত ঠাকুরমহাশয়ই আগে জানিতে পাইতেন।"

রাজা বলিলেন, "হৃদয় যার কঠিন হইয়া গিয়াছে দেবীর কথা সে শুনিতে পায় না।"

নক্ষত্ররায় পুরোহিতের মুখের দিকে চাহিলেন— ভাবটা এই যে, এ কথার একটা উত্তর দেওয়া আবশ্যক।

রঘুপতি আগুন হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি পাষণ্ড নাস্তিকের মতো কথা কহিতেছেন।"

নক্ষত্ররায় মৃদু প্রতিধ্বনির মতো বলিলেন, "হা, নাস্তিকের মতো কথা কহিতেছেন।"

গোবিন্দমাণিক্য উদ্দীপ্তমূর্তি পুরোহিতের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, রাজসভায় বসিয়া আপনি মিথ্যা সময় নষ্ট করিতেছেন। মন্দিরের কাজ বহিয়া যাইতেছে, আপনি মন্দিরে যান। যাইবার সময় পথে প্রচার করিয়া দিবেন যে, আমার রাজ্যে যে ব্যক্তি দেবতার নিকট জীব বলি দিবে তাহার নির্বাসনদণ্ড হইবে।"

তখন রঘুপতি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পইতা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তবে তুমি উচ্ছন্ন যাও।" চারি দিক হইতে হাঁ হাঁ করিয়া সভাসদ্‌গণ পুরোহিতের উপর গিয়া পড়িলেন। রাজা ইঙ্গিতে সকলকে নিষেধ করিলেন, সকলে সরিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুপতি বলিতে লাগিলেন, "তুমি রাজা, তুমি ইচ্ছা করিলে প্রজার সর্বস্ব হরণ করিতে পার, তাই বলিয়া তুমি মায়ের বলি হরণ করিবে! বটে! কী তোমার সাধ্য! আমি রঘুপতি মায়ের সেবক থাকিতে কেমন তুমি পূজার ব্যাঘাত কর দেখিব।"

মন্ত্রী রাজার স্বভাব বিলক্ষণ অবগত আছেন। তিনি জানেন, সংকল্প হইতে রাজাকে শীঘ্র বিচলিত করা যায় না। তিনি ধীরে ধীরে সভয়ে কহিলেন, "মহারাজ, আপনার স্বর্গীয় পিতৃপুরুষগণ বরাবর দেবীর নিকটে নিয়মিত বলি দিয়া আসিতেছেন। কখনো এক দিনের জন্য ইহার অন্যথা হয় নাই।"

মন্ত্রী থামিলেন। রাজা চুপ করিয়া রহিলেন। মন্ত্রী বলিলেন, "আজ এত দিন পরে আপনার পিতৃপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত সেই প্রাচীন পূজায়

ব্যাঘাত সাধন করিলে স্বর্গে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইবেন।"

মহারাজ ভাবিতে লাগিলেন। নক্ষত্ররায় বিজ্ঞতাসহকারে বলিলেন, "হা, স্বর্গে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইবেন।"

মন্ত্রী আবার বলিলেন, "মহারাজ, এক কাজ করুন, যেখানে সহস্র বলি হইয়া থাকে সেইখানে একশত বলির আদেশ করুন।"

সভাসদেরা বজ্রাহতের মতো অবাক হইয়া রহিল, গোবিন্দমাণিক্যও বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ পুরোহিত অধীর হইয়া সভা হইতে উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

এমন সময়ে কেমন করিয়া প্রহরীদের হাত এড়াইয়া খালি-গায়ে খালি-পায়ে একটি ছোটো ছেলে সভায় প্রবেশ করিল। রাজসভার মাঝখানে দাঁড়াইয়া রাজার মুখের দিকে বড়ো বড়ো চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কোথায়?"

বৃহৎ রাজসভার সমস্ত যেন সহসা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। দীর্ঘ গৃহে কেবল একটি ছেলের কণ্ঠধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল "দিদি কোথায়"।

রাজা তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে নামিয়া ছেলেকে কোলে করিয়া দৃঢ়স্বরে মন্ত্রীকে বলিলেন, "আজ হইতে আমার রাজ্যে বলিদান হইতে পারিবে না। ইহার উপর আর কথা কহিয়ো না।"

মন্ত্রী কহিলেন, "যে আজ্ঞে।"

তাতা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার দিদি কোথায়?"

রাজা বলিলেন, "মায়ের কাছে।"

তাতা অনেকক্ষণ মুখে আঙুল দিয়া চুপ করিয়া রহিল, একটা যেন ঠিকানা পাইল এমনি তাহার মনে হইল। আজ হইতে রাজা তাতাকে নিজের কাছে রাখিলেন। খুড়ো কেদারেশ্বর রাজবাড়িতে স্থান পাইল।

সভাসদেরা আপনা-আপনি বলাবলি করিতে লাগিল, "এ যে মগের মুল্লুক হইয়া দাঁড়াইল। আমরা তো জানি বৌদ্ধ মগেরাই রক্তপাত করে

না, অবশেষে আমাদের হিন্দুদের দেশেও কি সেই নিয়ম চলিবে নাকি।"

নক্ষত্ররায়ও তাহাদের মতে সম্পূর্ণ মত দিয়া কহিলেন, "হাঁ, শেষে হিন্দুদের দেশেও কি সেই নিয়ম চলিবে নাকি !"

সকলেই ভাবিল, অবনতির লক্ষণ ইহা হইতে আর কী হইতে পারে ! মগে হিন্দুতে তফাত রহিল কী !

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভুবনেশ্বরী-দেবী-মন্দিরের ভৃত্য জয়সিংহ জাতিতে রাজপুত, ক্ষত্রিয়। তাঁহার বাপ সুচেতসিংহ ত্রিপুরার রাজবাটীর একজন পুরাতন ভৃত্য ছিলেন। সুচেতসিংহের মৃত্যুকালে জয়সিংহ নিতান্ত বালক ছিলেন। এই অনাথ বালককে রাজা মন্দিরের কাজে নিযুক্ত করেন। জয়সিংহ মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতির দ্বারাই পালিত ও শিক্ষিত হইয়াছেন। ছেলেবেলা হইতে মন্দিরে পালিত হইয়া জয়সিংহ মন্দিরকে গৃহের মতো ভালোবাসিতেন; মন্দিরের প্রত্যেক সোপান, প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ডের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার মা ছিলেন না, ভুবনেশ্বরী-প্রতিমাকেই তিনি মায়ের মতো দেখিতেন। প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া তিনি কথা কহিতেন, তাঁহার একলা বোধ হইত না। তাঁহার আরো সঙ্গী ছিল। মন্দিরের বাগানের অনেকগুলি গাছকে তিনি নিজের হাতে মানুষ করিয়াছেন— তাঁহার চারি দিকে প্রতিদিন তাঁহার গাছগুলি বাড়িতেছে, লতাগুলি জড়াইতেছে, শাখা পুষ্পিত হইতেছে, ছায়া বিস্তৃত হইতেছে, শ্যামল বল্লরীর পল্লবস্তবকে যৌবনগর্বে নিকুঞ্জ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু জয়সিংহের এসকল প্রাণের কথা ভালোবাসার কথা বড়ো একটা কেহ জানিত না; তাঁহার বিপুল বল ও সাহসের জন্যই তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

মন্দিরের কাজকর্ম শেষ করিয়া জয়সিংহ তাঁহার কুটিরের দ্বারে বসিয়া আছেন। সম্মুখে মন্দিরের কানন। বিকাল হইয়া আসিয়াছে

অত্যন্ত ঘন মেঘ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। নববর্ষার জলে জয়সিংহের গাছগুলি স্নান করিতেছে, বৃষ্টিবিন্দুর নৃত্যে পাতায় পাতায় উৎসব পড়িয়া গিয়াছে, বর্ষাজলের ছোটো ছোটো শত শত প্রবাহ ঘোলা হইয়া কলকল করিয়া গোমতী নদীতে গিয়া পড়িতেছে— জয়সিংহ পরমানন্দে তাঁহার কাননের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। চারি দিকে মেঘের স্নিগ্ধ অন্ধকার, বনের ছায়া, ঘনপল্লবের শ্যামশ্রী, ভেকের কোলাহল, বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ঝরঝর শব্দ— কাননের মধ্যে এইরূপ নববর্ষার ঘোরঘটা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ জুড়াইয়া যাইতেছে।

ভিজিতে ভিজিতে রঘুপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জয়সিংহ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পা ধুইবার জল ও শুকনো কাপড় আনিয়া দিলেন।

রঘুপতি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমাকে কাপড় আনিতে কে বলিল!" বলিয়া কাপড়গুলা লইয়া ঘরের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন।

জয়সিংহ পা ধুইবার জল লইয়া অগ্রসর হইলেন। রঘুপতি বিরক্তির স্বরে কহিলেন, "থাক্ থাক্, তোমার ও জল রাখিয়া দাও।" বলিয়া পা দিয়া জলের ঘটি ঠেলিয়া ফেলিলেন।

জয়সিংহ সহসা এরূপ ব্যবহারের কারণ বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইলেন— কাপড় ভূমি হইতে তুলিয়া যথাস্থানে রাখিতে উদ্যত হইলেন, রঘুপতি পুনশ্চ বিরক্তভাবে কহিলেন, "থাক্ থাক্, ও কাপড়ে তোমার হাত দিতে হইবে না"— বলিয়া নিজে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া আসিলেন। জল লইয়া পা ধুইলেন।

জয়সিংহ ধীরে ধীরে কহিলেন, "প্রভু, আমি কি কোনো অপরাধ করিয়াছি?"

রঘুপতি কিঞ্চিৎ উগ্র স্বরে কহিলেন, "কে বলিতেছে যে তুমি অপরাধ করিয়াছ?"

জয়সিংহ ব্যথিত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

রঘুপতি অস্থিরভাবে কুটিরের দাওয়ায় বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে রাত্রি অনেক হইল ; ক্রমাগত বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। অবশেষে রঘুপতি জয়সিংহের পিঠে হাত দিয়া কোমল স্বরে কহিলেন, "বৎস, শয়ন করিতে যাও, রাত্রি অনেক হইল।"

জয়সিংহ রঘুপতির স্নেহের স্বরে বিচলিত হইয়া কহিলেন, "প্রভু আগে শয়ন করিতে যান, তার পরে আমি যাইব।"

রঘুপতি কহিলেন, "আমার বিলম্ব আছে। দেখো পুত্র, তোমার প্রতি আমি আজ কঠোর ব্যবহার করিয়াছি, কিছু মনে করিয়ো না। আমার মন ভালো ছিল না। সবিশেষ বৃত্তান্ত তোমাকে কাল প্রভাতে বলিব। আজ তুমি শয়ন করো গে।"

জয়সিংহ কহিলেন, "যে আজ্ঞে।" বলিয়া শয়ন করিতে গেলেন। রঘুপতি সমস্ত রাত বেড়াইতে লাগিলেন।

প্রভাতে জয়সিংহ গুরুকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুপতি কহিলেন, "জয়সিংহ, মায়ের বলি বন্ধ হইয়াছে।"

জয়সিংহ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কী কথা প্রভু!"

রঘুপতি। রাজার এইরূপ আদেশ।

জয়সিংহ। কোন্ রাজার?

রঘুপতি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "এখানে রাজা আবার কয় গণ্ডা আছে? মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য আদেশ করিয়াছেন, মন্দিরে জীববলি হইতে পারিবে না।"

জয়সিংহ। নরবলি?

রঘুপতি। আঃ, কী উৎপাত! আমি বলিতেছি জীববলি, তুমি শুনিতেছ নরবলি।

জয়সিংহ। কোনো জীববলিই হইতে পারিবে না?

রঘুপতি। না।

জয়সিংহ। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য এইরূপ আদেশ করিয়াছেন ?

রঘুপতি। হাঁ গো, এক কথা কতবার বলিব !

জয়সিংহ অনেক ক্ষণ কিছুই বলিলেন না, কেবল আপন মনে বলিতে লাগিলেন 'মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য'। গোবিন্দমাণিক্যকে জয়সিংহ ছেলেবেলা হইতে দেবতা বলিয়া জানিতেন। (আকাশের পূর্ণচন্দ্রের প্রতি শিশুদের যেমন একপ্রকার আসক্তি আছে, গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি জয়সিংহের সেইরূপ মনের ভাব ছিল।) গোবিন্দমাণিক্যের প্রশান্ত সুন্দর মুখ দেখিয়া জয়সিংহ প্রাণ-বিসর্জন করিতে পারিতেন।

রঘুপতি কহিলেন, "ইহার একটা তো প্রতিবিধান করিতে হইবে ?

জয়সিংহ কহিলেন, "তা অবশ্য। আমি মহারাজের কাছে যাই, তাঁকে মিনতি করিয়া বলি—"

রঘুপতি। সে চেষ্টা বৃথা।

জয়সিংহ। তবে কা করিতে হইবে ?

রঘুপতি কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "সে কাল বলিব। কাল তুমি প্রভাতে কুমার নক্ষত্ররায়ের নিকটে গিয়া তাঁহাকে গোপনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিবে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রভাতে নক্ষত্ররায় আসিয়া রঘুপতিকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, কী আদেশ করেন ?"

রঘুপতি কহিলেন, "তোমার প্রতি মায়ের আদেশ আছে। আগে মাকে প্রণাম করিবে চলো।"

উভয়ে মন্দিরে গেলেন। জয়সিংহও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। নক্ষত্ররায় ভুবনেশ্বরী-প্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন।

রঘুপতি নক্ষত্ররায়কে কহিলেন, "কুমার, তুমি রাজা হইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আমি রাজা হইব ! ঠাকুরমশায় যে কী বলেন তার ঠিক নাই।" বলিয়া নক্ষত্ররায় অত্যন্ত হাসিতে লাগিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "আমি বলিতেছি, তুমি রাজা হইবে !"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আপনি বলিতেছেন, আমি রাজা হইব !" বলিয়া রঘুপতির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "আমি কি মিথ্যা কথা বলিতেছি ?"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আপনি কি মিথ্যা কথা বলিতেছেন ? সে কেমন করিয়া হইবে ? দেখুন ঠাকুরমশায়, আমি কাল ব্যাঙের স্বপ্ন দেখিয়াছি। আচ্ছা, ব্যাঙের স্বপ্ন দেখিলে কী হয় বলুন দেখি।"

রঘুপতি হাস্য সম্বরণ করিয়া কহিলেন, "কেমনতরো ব্যাঙ বলো দেখি। তাহার মাথায় দাগ আছে তো ?"

নক্ষত্ররায় সগর্বে কহিলেন, "তাহার মাথায় দাগ আছে বৈকি। দাগ না থাকিলে চলিবে কেন ?"

রঘুপতি কহিলেন, "বটে ! তবে তো তোমার রাজটিকা লাভ হইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "তবে আমার রাজটিকা লাভ হইবে ! আপনি বলিতেছেন, আমার রাজটিকা লাভ হইবে ! আর, যদি না হয় ?"

রঘুপতি কহিলেন, "আমার কথা ব্যর্থ হইবে ! বল কী !"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "না না, সে কথা হইতেছে না। আপনি কিনা বলিতেছেন, আমার রাজটিকা লাভ হইবে, মনে করুন যদিই না হয়। দৈবাৎ কি এমন হয় না যে—"

রঘুপতি কহিলেন, "না না, ইহার অন্যথা হইবে না।"

নক্ষত্ররায়। ইহার অন্যথা হইবে না ! আপনি বলিতেছেন, ইহার অন্যথা হইবে না ! দেখুন ঠাকুরমশায়, আমি রাজা হইলে আপনাকে মন্ত্রী করিব।

রঘুপতি। মন্ত্রিত্বের পদে আমি পদাঘাত করি।

নক্ষত্ররায় উদারভাবে কহিলেন, "আচ্ছা, জয়সিংহকে মন্ত্রী করিব।"

রঘুপতি কহিলেন, "সে কথা পরে হইবে। রাজা হইবার আগে কী করিতে হইবে সেটা শোনো আগে। মা রাজরক্ত দেখিতে চান, স্বপ্নে আমার প্রতি এই আদেশ হইয়াছে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "মা রাজরক্ত দেখিতে চান, স্বপ্নে আপনার প্রতি এই আদেশ হইয়াছে! এ তো বেশ কথা।"

রঘুপতি কহিলেন, "তোমাকে গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত আনিতে হইবে।"

নক্ষত্ররায় খানিকটা হাঁ করিয়া রহিলেন। এ কথাটা তত 'বেশ' বলিয়া মনে হইল না।

রঘুপতি তীব্র স্বরে কহিলেন, "সহসা ভ্রাতৃস্নেহের উদয় হইল নাকি!"

নক্ষত্ররায় কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, "হাঃ হাঃ, ভ্রাতৃস্নেহ! ঠাকুরমশায় বেশ বলিলেন যা-হোক, ভ্রাতৃস্নেহ!"

এমন মজার কথা, এমন হাসিবার কথা যেন আর হয় না। ভ্রাতৃস্নেহ! কী লজ্জার বিষয়! কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, নক্ষত্ররায়ের প্রাণের ভিতরে ভ্রাতৃস্নেহ জাগিতেছে, তা হাসিয়া উড়াইবার জো নাই।

রঘুপতি কহিলেন, "তা হইলে কী করিবে বলো।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "কী করিব বলুন।"

রঘুপতি। কথাটা ভালো করিয়া শোনো। তোমাকে গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত মায়ের দর্শনার্থ আনিতে হইবে।

নক্ষত্ররায় মন্ত্রের মতো বলিয়া গেলেন, "গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত মায়ের দর্শনার্থ আনিতে হইবে।"

রঘুপতি নিতান্ত ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "না, তোমার দ্বারা কিছু হইবে না।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "কেন হইবে না? যাহা বলিবেন তাহাই হইবে।

আপনি তো আদেশ করিতেছেন ?"

রঘুপতি। হাঁ, আমি আদেশ করিতেছি।

নক্ষত্ররায়। কী আদেশ করিতেছেন ?

রঘুপতি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "মায়ের ইচ্ছা, তিনি রাজরক্ত দর্শন করিবেন। তুমি গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত দেখাইয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবে, এই আমার আদেশ।"

নক্ষত্ররায়। আমি আজই গিয়া ফতেখাঁকে এই কাজে নিযুক্ত করিব।

রঘুপতি। না না, আর কোনো লোককে ইহার বিন্দুবিসর্গ জানাইয়ো না। কেবল জয়সিংহকে তোমার সাহায্যে নিযুক্ত করিব। কালি প্রাতে আসিয়ো, কী উপায়ে এ কার্য সাধন করিতে হইবে কাল বলিব।

নক্ষত্ররায় রঘুপতির হাত এড়াইয়া বাঁচিলেন। যত শীঘ্র পারিলেন বাহির হইয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্ররায় চলিয়া গেলে জয়সিংহ কহিলেন, "গুরুদেব, এমন ভয়ানক কথা কখনও শুনি নাই। আপনি মায়ের সম্মুখে মায়ের নাম করিয়া ভাইকে দিয়া ভ্রাতৃহত্যার প্রস্তাব করিলেন, আর আমাকে তাই দাঁড়াইয়া শুনিতে হইল !"

রঘুপতি বলিলেন, "আর কী উপায় আছে বলো।"

জয়সিংহ কহিলেন, "উপায় ! কিসের উপায় !"

রঘুপতি। তুমিও যে নক্ষত্ররায়ের মতো হইলে দেখিতেছি। এতক্ষণ তবে কী শুনিলে।

জয়সিংহ। যাহা শুনিলাম তাহা শুনিবার যোগ্য নহে, তাহা শুনিলে পাপ আছে।

রঘুপতি। পাপপুণ্যের তুমি কী বুঝ !

জয়সিংহ। এতকাল আপনার কাছে শিক্ষা পাইলাম, পাপপুণ্যের কিছুই বুঝি না কি!

[রঘুপতি। শোনো বৎস, তোমাকে তবে আর-এক শিক্ষা দিই। পাপপুণ্য কিছুই নাই। কেই বা পিতা, কেই বা ভ্রাতা, কেই বা কে? হত্যা যদি পাপ হয় তো সকল হত্যাই সমান। কিন্তু কে বলে হত্যা পাপ? হত্যা তো প্রতিদিনই হইতেছে। কেহ বা মাথায় একখণ্ড পাথর পড়িয়া হত হইতেছে, কেহ বা বন্যায় ভাসিয়া গিয়া হত হইতেছে, কেহ বা মড়কের মুখে পড়িয়া হত হইতেছে, কেহ বা মনুষ্যের ছুরিকাঘাতে হত হইতেছে। কত পিপীলিকা আমরা প্রত্যহ পদতলে দলন করিয়া যাইতেছি, আমরা তাহাদের অপেক্ষা এমনই কি বড়ো! এই-সকল ক্ষুদ্র প্রাণীদের জীবন-মৃত্যু খেলা বৈ তো নয়, মহাশক্তির মায়া বৈ তো নয়। কালরূপিণী মহামায়ার নিকটে প্রতিদিন এমন কত লক্ষ কোটি প্রাণীর বলিদান হইতেছে— জগতের চতুর্দিক হইতে জীবশোণিতের স্রোত তাঁহার মহাখর্পরে আসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে— আমিই নাহয় সেই স্রোতে আর-একটি কণা যোগ করিয়া দিলাম। তাঁহার বলি তিনিই এক কালে গ্রহণ করিতেন, আমি নাহয় মাঝখানে থাকিয়া উপলক্ষ হইলাম।

তখন জয়সিংহ প্রতিমার দিকে ফিরিয়া কহিতে লাগিলেন, "এই-জন্যই কি তোকে সকলে মা বলে মা? তুই এমন পাষাণী! রাক্ষসী, সমস্ত জগৎ হইতে রক্ত নিষ্পেষণ করিয়া লইয়া উদরে পূরিবার জন্য তুই ঐ লোল জিহ্বা বাহির করিয়াছিস! (স্নেহ প্রেম মমতা সৌন্দর্য ধর্ম সমস্তই মিথ্যা, সত্য কেবল তোর ঐ অনন্ত রক্ততৃষা!) তোরই উদর পূরণের জন্য মানুষ মানুষের গলায় ছুরি বসাইবে, ভাই ভাইকে খুন করিবে, পিতাপুত্রে কাটাকাটি করিবে। নিষ্ঠুর, সত্যসত্যই এই যদি তোর ইচ্ছা তবে মেঘ রক্তবর্ষণ করে না কেন! করুণাস্বরূপিণী নদী

রক্তস্রোত লইয়া রক্তসমুদ্রে গিয়া পড়ে না কেন! না না মা, তুই প্রকাশ করিয়া বল্— এ শিক্ষা মিথ্যা, এ শাস্ত্র মিথ্যা— আমার মাকে মা বলে না, সন্তানরক্তপিপাসু রাক্ষসী বলে, এ কথা আমি সহিতে পারিব না।"

জয়সিংহের চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল— তিনি নিজের কথা লইয়া নিজেই ভাবিতে লাগিলেন। এত কথা ইতিপূর্বে কখনও তাঁহার মনে হয় নাই, রঘুপতি যদি তাঁহাকে নূতন শাস্ত্র শিক্ষা দিতে না আসিতেন তবে কখনোই তাঁহার এত কথা মনেই আসিত না।

রঘুপতি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তবে তো বলিদানের পালা একেবারে উঠাইয়া দিতে হয়।"

জয়সিংহ অতি শৈশবকাল হইতে প্রতিদিন বলিদান দেখিয়া আসিতেছেন। এইজন্য মন্দিরে যে বলিদান কোনো কালে বন্ধ হইতে পারে কিম্বা বন্ধ হওয়া উচিত এ কথা কিছুতেই তাঁহার মনে লাগে না। এমন-কি, এ কথা মনে করিতে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগে। এইজন্য রঘুপতির কথার উত্তরে জয়সিংহ বলিলেন, "সে স্বতন্ত্র কথা। তাহার অন্য কোনো অর্থ আছে। তাহাতে তো কোনো পাপ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ভাইকে ভাই হত্যা করিবে! তাই বলিয়া মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যকে— প্রভু, আপনার পায়ে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করি, আমাকে প্রবঞ্চনা করিবেন না, সত্যই কি মা স্বপ্নে কহিয়াছেন রাজরক্ত নহিলে তাঁর তৃপ্তি হইবে না?"

রঘুপতি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "সত্য নহিলে কি মিথ্যা কহিতেছি? তুমি কি আমাকে অবিশ্বাস কর?"

জয়সিংহ রঘুপতির পদধূলি লইয়া কহিলেন, "গুরুদেবের প্রতি আমার বিশ্বাস শিথিল না হয় যেন। কিন্তু নক্ষত্ররায়েরও তো রাজকুলে জন্ম।"

রঘুপতি কহিলেন, "দেবতাদের স্বপ্ন ইঙ্গিতমাত্র; সকল কথা শুনা যায় না, অনেকটা বুঝিয়া লইতে হয়। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে

গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি দেবীর অসন্তোষ হইয়াছে, অসন্তোষের সম্পূর্ণ কারণও জন্মিয়াছে। অতএব দেবী যখন রাজরক্ত চাহিয়াছেন তখন বুঝিতে হইবে তাহা গোবিন্দমাণিক্যেরই রক্ত।"

জয়সিংহ কহিলেন, "তা যদি সত্য হয় তবে আমিই রাজরক্ত আনিব— নক্ষত্ররায়কে পাপে লিপ্ত করিব না।"

রঘুপতি কহিলেন, "দেবীর আদেশ পালন করিতে কোনো পাপ নাই।"

জয়সিংহ। পুণ্য আছে তো প্রভু! সে পুণ্য আমি উপার্জন করিব।

রঘুপতি কহিলেন, "তবে সত্য করিয়া বলি বৎস! আমি তোমাকে শিশুকাল হইতে পুত্রের অধিক যত্নে প্রাণের অধিক ভালোবাসিয়া পালন করিয়া আসিয়াছি, আমি তোমাকে হারাইতে পারিব না। নক্ষত্ররায় যদি গোবিন্দমাণিক্যকে বধ করিয়া রাজা হয় তবে কেহ তাহাকে একটি কথা কহিবে না, কিন্তু তুমি যদি রাজার গায়ে হাত তোল তো তোমাকে আর আমি ফিরিয়া পাইব না।"

জয়সিংহ কহিলেন, "আমার স্নেহে— পিতা, আমি অপদার্থ— আমার স্নেহে তুমি একটি পিপীলিকারও হানি করিতে পাইবে না। আমার প্রতি স্নেহে তুমি যদি পাপে লিপ্ত হও তবে তোমার সে স্নেহ আমি বেশি দিন ভোগ করিতে পারিব না, সে স্নেহের পরিণাম কখনোই ভালো হইবে না।"

রঘুপতি তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, সে কথা পরে হইবে। কাল নক্ষত্ররায় আসিলে যা হয় একটা ব্যবস্থা হইবে।"

জয়সিংহ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'আমিই রাজরক্ত আনিব। মায়ের নামে গুরুদেবের নামে ভ্রাতৃহত্যা ঘটিতে দিব না।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জয়সিংহের সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। গুরুর সহিত যে কথা লইয়া আলোচনা হইয়াছিল দেখিতে দেখিতে তাহার শাখা-প্রশাখা বাহির হইতে লাগিল। অধিকাংশ সময়েই আরম্ভ আমাদের আয়ত্ত, শেষ আমাদের আয়ত্ত নহে। চিন্তা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। জয়সিংহের মনে অনিবার্য বেগে এমন-সকল কথা উঠিতে লাগিল যাহা তাঁহার আশৈশব বিশ্বাসের মূলে অবিশ্রাম আঘাত করিতে লাগিল। জয়সিংহ পীড়িত ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন।

কিন্তু দুঃস্বপ্নের মতো ভাবনা কিছুতেই ক্ষান্ত হইতে চায় না। যে দেবীকে জয়সিংহ এতদিন মা বলিয়া জানিতেন গুরুদেব আজ কেন তাঁহার মাতৃত্ব অপহরণ করিলেন, কেন তাঁহাকে হৃদয়হীন শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন? শক্তির সন্তোষই কী আর অসন্তোষই কী? শক্তির চক্ষুই বা কোথায় কর্ণই বা কোথায়? শক্তি তো মহারথের ন্যায় তাহার সহস্র চক্রের তলে জগৎ কর্ষিত করিয়া ঘর্ঘর শব্দে চলিয়া যাইতেছে; তাহাকে অবলম্বন করিয়া কে চলিল, তাহার তলে পড়িয়া কে চূর্ণ হইল, তাহার উপরে উঠিয়া কে উৎসব করিতেছে, তাহার নিম্নে পড়িয়া কে আর্তনাদ করিতেছে, সে তাহার কী জানিবে? তাহার সারথি কি কেহ নাই? পৃথিবীর নিরীহ অসহায় ভীরু জীবদিগের রক্ত বাহির করিয়া কালরূপিণী নিষ্ঠুর শক্তির তৃষা নির্বাণ করিতে হইবে, এই কি আমার ব্রত? কেন? সে তো আপনার কাজ আপনিই করিতেছে—তাহার দুর্ভিক্ষ আছে, বন্যা আছে, ভূমিকম্প আছে, জরা মারী অগ্নিদাহ আছে, নির্দয় মানব-হৃদয়স্থিত হিংসা আছে, ক্ষুদ্র আমাকে তাহার আবশ্যক কী?'

তাহার পরদিন যে প্রভাত হইল তাহা অতি মনোহর প্রভাত। বৃষ্টির শেষ হইয়াছে। পূর্বদিকে মেঘ নাই। সূর্যকিরণ যেন বর্ষার জলে

ধৌত ও স্নিগ্ধ। বৃষ্টিবিন্দু ও সূর্যকিরণে দশ দিক ঝলমল করিতেছে। শুভ্র আনন্দপ্রভা আকাশে প্রান্তরে অরণ্যে নদীস্রোতে বিকশিত শ্বেত শতদলের ন্যায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নীল আকাশে চিল ভাসিয়া যাইতেছে। ইন্দ্রধনুর তোরণের নীচে দিয়া বকের শ্রেণী উড়িয়া চলিয়াছে। কাঠবিড়ালিরা গাছে গাছে ছুটাছুটি করিতেছে। দুই-একটি অতি ভীরু খরগোশ সচকিতে ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আবার আড়াল খুঁজিতেছে। ছাগশিশুরা অতি দুর্গম পাহাড়ে উঠিয়া ঘাস ছিঁড়িয়া খাইতেছে। গোরুগুলি আজ মনের আনন্দে মাঠময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাখাল গান ধরিয়াছে। কলসকক্ষ মায়ের আঁচল ধরিয়া আজ ছেলেমেয়েরা বাহির হইয়াছে। বৃদ্ধ পূজার জন্য ফুল তুলিতেছে। স্নানের জন্য নদীতে আজ অনেক লোক সমবেত হইয়াছে, কলকল স্বরে তাহারা গল্প করিতেছে— নদীর কলধ্বনিরও বিরাম নাই। আষাঢ়ের প্রভাতে এই জীবময়ী আনন্দময়ী ধরণীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জয়সিংহ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

জয়সিংহ প্রতিমার দিকে চাহিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, "কেন মা, আজ এত অপ্রসন্ন কেন? একদিন তোমার জীবের রক্ত তুমি দেখিতে পাও নাই বলিয়া এত ভ্রূকুটি? আমাদের হৃদয়মধ্যে চাহিয়া দেখো, ভক্তির কি কিছু অভাব দেখিতেছ? ভক্তের হৃদয় পাইলেই কি তোমার তৃপ্তি হয় না, নিরপরাধের শোণিত চাই? আচ্ছা মা, সত্য করিয়া বল দেখি, পুণ্যের-শরীর গোবিন্দমাণিক্যকে পৃথিবী হইতে অপসৃত করিয়া এখানে দানবের রাজত্ব স্থাপন করাই কি তোর অভিপ্রায়? রাজরক্ত কি নিতান্তই চাই? তোর মুখের উত্তর না শুনিলে আমি কখনোই রাজহত্যা ঘটিতে দিব না, আমি ব্যাঘাত করিব। বল্, হাঁ কি না।"

সহসা বিজন মন্দিরে শব্দ উঠিল "হাঁ"।

জয়সিংহ চমকিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে

পাইলেন না, মনে হইল যেন ছায়ার মতো কী একটা কাঁপিয়া গেল। স্বর শুনিয়া প্রথমেই তাঁহার মনে হইয়াছিল, যেন তাঁর গুরুর কণ্ঠস্বর। পরে মনে করিলেন, মা তাঁহাকে তাঁহার গুরুর কণ্ঠস্বরেই আদেশ করিলেন ইহাই সম্ভব। তাঁহার গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিমাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া সশস্ত্রে বাহির হইয়া পড়িলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গোমতী নদীর দক্ষিণ দিকের এক স্থানের পাড় অতিশয় উচ্চ। বর্ষার ধারা ও ছোটো ছোটো স্রোত এই উন্নত ভূমিকে নানা গুহাগহ্বরে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার কিছু দূরে প্রায় অর্ধচন্দ্রাকারে বড়ো বড়ো শাল ও গাম্ভারি গাছে এই শতধাবিদীর্ণ ভূমিখণ্ডকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু মাঝখানের এই জমিটুকুর মধ্যে বড়ো গাছ একটিও নাই। কেবল স্থানে স্থানে ঢিপির উপর ছোটো ছোটো শাল গাছ বাড়িতে পারিতেছে না, কেবল বাঁকিয়া কালো হইয়া পড়িয়াছে। বিস্তর পাথর ছড়ানো। এক হাত দুই হাত প্রশস্ত ছোটো ছোটো জলস্রোত কত শত আঁকাবাঁকা পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া, মিলিয়া, বিভক্ত হইয়া, নদীতে গিয়া পড়িতেছে। এই স্থান অতি নির্জন, এখানকার আকাশ গাছের দ্বারা অবরুদ্ধ নহে। এখান হইতে গোমতী নদী ও তাহার পরপারের বিচিত্রবর্ণ শস্যক্ষেত্রসকল অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। প্রতিদিন প্রাতে রাজা গোবিন্দমাণিক্য এইখানে বেড়াইতে আসিতেন, সঙ্গে একটি সঙ্গী বা একটি অনুচরও আসিত না। জেলেরা কখনো কখনো গোমতীতে মাছ ধরিতে আসিয়া দূর হইতে দেখিতে পাইত তাহাদের সৌম্যমূর্তি রাজা যোগীর ন্যায় স্থিরভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখে প্রভাতের জ্যোতি কি তাঁহার আত্মার জ্যোতি বুঝা যাইত না। আজকাল বর্ষার দিনে প্রতিদিন এখানে আসিতে পারিতেন না, কিন্তু

বর্ষা-উপশমে যেদিন আসিতেন সেদিন ছোটো তাতাকে সঙ্গে করিয়া আনিতেন।

তাতাকে আর তাতা বলিতে ইচ্ছা করে না। একমাত্র যাহার মুখে তাতা সম্বোধন মানাইত সে তো আর নাই। পাঠকের কাছে তাতা শব্দের কোনো অর্থ নাই কিন্তু হাসি যখন সকালবেলায় শালবনে দুষ্টুমি করিয়া শালগাছের আড়ালে লুকাইয়া তাহার সুমিষ্ট তীক্ষ্ণ স্বরে তাতা বলিয়া ডাকিত এবং তাহার উত্তরে গাছে গাছে দোয়েল ডাকিয়া উঠিত, দূর কানন হইতে প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিত, তখন সেই তাতা শব্দ অর্থে পরিপূর্ণ হইয়া কানন ব্যাপ্ত করিত, তখন সেই তাতা সম্বোধন একটি বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অতি কোমল স্নেহনীড় পরিত্যাগ করিয়া পাখির মতো স্বর্গের দিকে উড়িয়া যাইত— তখন সেই একটি স্নেহসিক্ত মধুর সম্বোধন প্রভাতের সমুদয় পাখির গান লুটিয়া লইত, প্রভাত-প্রকৃতির আনন্দময় সৌন্দর্যের সহিত একটি ক্ষুদ্র বালিকার আনন্দময় স্নেহের ঐক্য দেখাইয়া দিত। এখন সে বালিকা নাই— বালকটি আছে কিন্তু তাতা নাই। বালকটি এ সংসারের সহস্র লোকের, সহস্র বিষয়ের, কিন্তু তাতা কেবলমাত্র সেই বালিকারই। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য এই বালককে ধ্রুব বলিয়া ডাকিতেন, আমরাও তাহাই বলিয়া ডাকিব।

মহারাজ পূর্বে একা গোমতীতীরে আসিতেন, এখন ধ্রুবকে সঙ্গে করিয়া আনেন। তাহার পবিত্র সরল মুখচ্ছবিতে তিনি দেবলোকের ছায়া দেখিতে পান। মধ্যাহ্নে সংসারের আবর্তের মধ্যে রাজা যখন প্রবেশ করেন তখন বৃদ্ধ বিজ্ঞ মন্ত্রীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, তাঁহাকে পরামর্শ দেয়— আর প্রভাত হইলে একটি শিশু তাঁহাকে সংসারের বাহিরে লইয়া আসে— তাহার বড়ো বড়ো দুটি নীরব চক্ষুর সম্মুখে বিষয়ের সহস্র কুটিলতা সংকুচিত হইয়া যায়— শিশুর হাত ধরিয়া মহারাজ বিশ্বজগতের মধ্যবর্তী অনন্তের দিকে প্রসারিত একটি উদার সরল বিস্তৃত

রাজপথে গিয়া দাঁড়ান। সেখানে অনন্ত সুনীল আকাশচন্দ্রাতপের নিম্নস্থিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাসভা দেখিতে পাওয়া যায়; ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোক সপ্তলোকের সংগীতের আভাস শুনা যায়; সেখানে সরল পথে সকলই সরল সহজ শোভন বলিয়া বোধ হয়; কেবলই অগ্রসর হইতে উৎসাহ হয়— উৎকট ভাবনা-চিন্তা অসুখ-অশান্তি দূর হইয়া যায়। মহারাজ সেই প্রভাতে, নির্জনে, বনের মধ্যে, নদীর তীরে, মুক্ত আকাশে, একটি শিশুর প্রেমে নিমগ্ন হইয়া অসীম প্রেমসমুদ্রের পথ দেখিতে পান।

গোবিন্দমাণিক্য ধ্রুবকে কোলে করিয়া লইয়া তাহাকে ধ্রুবোপাখ্যান শুনাইতেছেন, সে যে বড়ো একটা-কিছু বুঝিতেছে তাহা নহে—কিন্তু রাজার ইচ্ছা ধ্রুবের মুখে আধো-আধো স্বরে এই ধ্রুবোপাখ্যান আবার ফিরিয়া শুনেন।

গল্প শুনিতে শুনিতে ধ্রুব বলিল, "আমি বনে যাব।"

রাজা বলিলেন, "কী করতে বনে যাবে?"

ধ্রুব বলিল, "হয়িকে দেখতে যাব।"

রাজা বলিলেন, "আমরা তো বনে এসেছি, হরিকে দেখতে এসেছি।"

ধ্রুব। হয়ি কোথায়?

রাজা। এইখানেই আছেন।

ধ্রুব কহিল, "দিদি কোথায়?" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া পিছনে চাহিয়া দেখিল; তাহার মনে হইল, দিদি যেন আগেকার মতো পিছন হইতে সহসা তাহার চোখ টিপিবার জন্য আসিতেছে, কাহাকেও না পাইয়া ঘাড় নামাইয়া চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কোথায়?"

রাজা কহিলেন, "হরি তোমার দিদিকে ডেকে নিয়েছেন।"

ধ্রুব কহিল, "হয়ি কোথায়?"

রাজা কহিলেন, "তাঁকে ডাকো বৎস। তোমাকে সেই-যে শ্লোক শিখিয়ে দিয়েছিলেম সেইটে বলো।"

ধ্রুব দুলিয়া দুলিয়া বলিতে লাগিল—

হরি, তোমায় ডাকি, বালক একাকী,
আঁধার অরণ্যে ধাই হে।
গহন তিমিরে নয়নের নীরে
পথ খুঁজে নাহি পাই হে।
সদা মনে হয় কী করি, কী করি,
কখন আসিবে কাল-বিভাবরী,
তাই ভয়ে মরি, ডাকি হরি হরি,
হরি বিনা কেহ নাই হে।
নয়নের জল হবে না বিফল,
তোমায় সবে বলে ভকতবৎসল,
সেই আশা মনে করেছি সম্বল,
বেঁচে আছি আমি তাই হে।
আঁধারেতে জাগে তোমার আঁখিতারা,
তোমার ভক্ত কভু হয় না পথহারা,
ধ্রুব তোমায় চাহে তুমি ধ্রুবতারা,
আর কার পানে চাই হে।

'র'য়ে 'ল'য়ে 'ড'য়ে 'দ'য়ে উলটপালট করিয়া, অর্ধেক কথা মুখের মধ্যে রাখিয়া, অর্ধেক কথা উচ্চারণ করিয়া, ধ্রুব দুলিয়া দুলিয়া সুধাময় কণ্ঠে এই শ্লোক পাঠ করিল। শুনিয়া রাজার প্রাণ আনন্দে নিমগ্ন হইয়া গেল, প্রভাত দ্বিগুণ মধুর হইয়া উঠিল, চারি দিকে নদী কানন তরুলতা হাসিতে লাগিল। কনকসুধাসিক্ত নীলাকাশে তিনি কাহার অনুপম সুন্দর সহাস্য মুখচ্ছবি দেখিতে পাইলেন। ধ্রুব যেমন তাঁহার কোলে বসিয়া আছে তাঁহাকেও তে[illegible]কে যেন বাহুপাশের মধ্যে, কো[illegible] তুলিয়া লইল। তি[illegible]লোকে, আপনার চারি [illegible],

বিশ্বচরাচরকে, কাহার কোলের উপর দেখিতে পাইলেন। তাঁহার আনন্দ ও প্রেম সূর্যকিরণের ন্যায় দশ দিকে বিকিরিত হইয়া আকাশ পূর্ণ করিল।

এমন সময় সশস্ত্র জয়সিংহ গুহাপথ দিয়া সহসা রাজার সম্মুখে আসিয়া উত্থিত হইলেন।

রাজা তাঁহাকে দুই হাত বাড়াইয়া দিলেন; কহিলেন, "এসো জয়সিংহ, এসো।" রাজা তখন শিশুর সহিত মিশিয়া শিশু হইয়াছেন, তাঁহার রাজমর্যাদা কোথায়!

জয়সিংহ রাজাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। জয়সিংহ কহিলেন, "মহারাজ, এক নিবেদন আছে।"

রাজা কহিলেন, "কী, বলো।"

জয়সিংহ। মা আপনার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন।

রাজা। কেন, আমি তাঁর অসন্তোষের কাজ কী করিয়াছি?

জয়সিংহ। মহারাজ বলি বন্ধ করিয়া দেবীর পূজার ব্যাঘাত করিয়াছেন।

রাজা বলিয়া উঠিলেন, "কেন জয়সিংহ, কেন এ হিংসার লালসা! মাতৃক্রোড়ে সন্তানের রক্তপাত করিয়া তুমি মাকে প্রসন্ন করিতে চাও!"

জয়সিংহ ধীরে ধীরে রাজার পায়ের কাছে বসিলেন। ধ্রুব তাঁহার তলোয়ার লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

জয়সিংহ কহিলেন, "কেন মহারাজ, শাস্ত্রে তো বলিদানের ব্যবস্থা আছে।"

রাজা কহিলেন, "শাস্ত্রের যথার্থ বিধি কেই বা পালন করে? আপনার প্রবৃত্তি অনুসারে সকলেই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। যখন দেবীর সম্মুখে বলির সকর্দম রক্ত সর্বাঙ্গে মাখিয়া সকলে উৎকট চীৎকারে, ভীষণ উল্লাসে প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতে থাকে তখন কি তাহারা মায়ের পূজা করে, না, নিজের হৃদয়ের মধ্যে যে হিংসারাক্ষসী আছে

সেই রাক্ষসীটার পূজা করে? হিংসার নিকটে বলিদান দেওয়া শাস্ত্রের বিধি নহে, হিংসাকে বলি দেওয়াই শাস্ত্রের বিধি।”

জয়সিংহ অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। কল্য রাত্রি হইতে তাঁহার মনেও এমন অনেক কথা তোলপাড় হইয়াছে।

অবশেষে বলিলেন, “আমি মায়ের স্বমুখে শুনিয়াছি— এ বিষয়ে আর কোনো সংশয় থাকিতে পারে না। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, তিনি মহারাজের রক্ত চান।” বলিয়া জয়সিংহ প্রভাতের মন্দিরের ঘটনা রাজাকে বলিলেন।

রাজা হাসিয়া বলিলেন, “এ তো মায়ের আদেশ নয়, এ রঘুপতির আদেশ। রঘুপতিই অন্তরাল হইতে তোমার কথার উত্তর দিয়াছিলেন।”

রাজার মুখে এই কথা শুনিয়া জয়সিংহ একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনেও এইরূপ সংশয় একবার চকিতের মতো উঠিয়াছিল, কিন্তু আবার বিদ্যুতের মতো অন্তর্হিত হইয়াছিল। রাজার কথায় সেই সন্দেহে আবার আঘাত লাগিল।

জয়সিংহ অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “না মহারাজ, আমাকে ক্রমাগত সংশয় হইতে সংশয়ান্তরে লইয়া যাইবেন না— আমাকে তীর হইতে ঠেলিয়া সমুদ্রে ফেলিবেন না— আপনার কথায় আমার চারি দিকের অন্ধকার কেবল বাড়িতেছে। আমার যে বিশ্বাস যে ভক্তি ছিল তাই থাক্— তাহার পরিবর্তে এ কুয়াসা আমি চাই না। মায়ের আদেশই হউক আর গুরুর আদেশই হউক, সে একই কথা— আমি পালন করিব।” বলিয়া বেগে উঠিয়া তাঁহার তলোয়ার খুলিলেন— তলোয়ার রৌদ্রকিরণে বিদ্যুতের মতো চক্‌মক্ করিয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া ধ্রুব ঊর্ধ্বস্বরে কাঁদিয়া উঠিল; তাহার ছোটো দুইটি হাতে রাজাকে জড়াইয়া রাজাকে প্রাণপণে আচ্ছাদন করিয়া ধরিল— রাজা জয়সিংহের প্রতি লক্ষ না করিয়া ধ্রুবকেই বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

জয়সিংহ তলোয়ার দূরে ফেলিয়া দিলেন। ধ্রুবের পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "কোনো ভয় নেই, বৎস, কোনো ভয় নেই। আমি এই চলিলাম, তুমি ওই মহৎ আশ্রয়ে থাকো, ওই বিশাল বক্ষে বিরাজ করো— তোমাকে কেহ বিচ্ছিন্ন করিবে না।" বলিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

সহসা আবার কী ভাবিয়া ফিরিয়া কহিলেন, "মহারাজকে সাবধান করিয়া দিই, আপনার ভ্রাতা নক্ষত্ররায় আপনার বিনাশের পরামর্শ করিয়াছেন। ২৯শে আষাঢ় চতুর্দশ দেবতার পূজার রাত্রে আপনি সতর্ক থাকিবেন।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "নক্ষত্র কোনোমতেই আমাকে বধ করিতে পারিবে না, সে আমাকে ভালোবাসে।"

জয়সিংহ বিদায় লইয়া গেলেন।

রাজা ধ্রুবের দিকে চাহিয়া ভক্তিভাবে কহিলেন, "তুমিই আজ রক্তপাত হইতে ধরণীকে রক্ষা করিলে, সেই উদ্দেশেই তোমার দিদি তোমাকে রাখিয়া গিয়াছেন।" বলিয়া ধ্রুবের অশ্রুসিক্ত দুইটি কপোল মুছাইয়া দিলেন।

ধ্রুব গম্ভীরমুখে কহিল, "দিদি কোথায়?"

এমন সময় মেঘ আসিয়া সূর্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, নদীর উপর কালো ছায়া পড়িল। দূরের বনান্ত মেঘের মতোই কালো হইয়া উঠিল। বৃষ্টিপাতের লক্ষণ দেখিয়া রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

মন্দির অনেক দূরে নয়। কিন্তু জয়সিংহ বিজন নদীর ধার দিয়া অনেক ঘুরিয়া ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে চলিলেন। বিস্তর ভাবনা তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। এক জায়গায় নদীর তীরে গাছের তলায়

বসিয়া পড়িলেন। দুই হস্তে মুখ আচ্ছাদন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছি, অথচ সংশয় যাইতেছে না। আজ হইতে কেই বা আমার সংশয় ঘুচাইবে? কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ আজ হইতে কে তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিবে? সংসারের সহস্র কোটি পথের মোহনায় দাঁড়াইয়া কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব কোন্‌টা যথার্থ পথ? প্রান্তরের মধ্যে আমি অন্ধ একাকী দাঁড়াইয়া আছি, আজ আমার যষ্টি ভাঙিয়া গেছে।'

জয়সিংহ যখন উঠিলেন তখন বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে মন্দিরের দিকে চলিলেন। দেখিলেন, বিস্তর লোক কোলাহল করিতে করিতে মন্দিরের দিক হইতে দল বাঁধিয়া চলিয়া আসিতেছে।

বুড়া বলিতেছে, "বাপ-পিতামহর কাল থেকে এই তো চলে আসছে জানি, আজ রাজার বুদ্ধি কি তাঁদের সকলকেই ছাড়িয়ে উঠল?"

যুবা বলিতেছে, "এখন আর মন্দিরে আসতে ইচ্ছে করে না, পূজার সে ধূম নেই।"

কেহ বলিল, "এ যে নবাবের রাজত্ব হয়ে দাঁড়ালো!" তাহার ভাব এই যে, বলিদান সম্বন্ধে দ্বিধা একজন মুসলমানের মনেই জন্মাইতে পারে, কিন্তু একজন হিন্দুর মনে জন্মানো অত্যন্ত আশ্চর্য।

মেয়েরা বলিতে লাগিল, "এ রাজ্যের মঙ্গল হবে না।"

একজন কহিল, "পুরুত-ঠাকুর তো স্বয়ং বললেন যে, মা স্বপ্নে বলেছেন, তিন মাসের মধ্যে এ দেশ মড়কে উচ্ছন্ন যাবে!"

হারু বলিল, "এই দেখো-না কেন, মোধো আজ দেড় বছর ধরে ব্যামো ভুগে বরাবর বেঁচে এসেছে, যেই বলি বন্ধ হল অমনি সে মারা গেল।"

কান্ত বলিল, "তা কেন, আমার ভাশুরপো, সে যে মরবে এ কে জানত? তিন দিনের জ্বর। যেমনি কবিরাজের বড়িটি খাওয়া অমনি

চোখ উল্টে গেল।" ভাত্তরপোর শোকে এবং রাজ্যের অমঙ্গল-আশঙ্কায় ক্ষান্ত কাতর হইয়া পড়িল।

তিনকড়ি কহিল, "সেদিন মথুরহাটির গঞ্জে আগুন লাগল, একখানা চালাও বাকি রইল না।"

চিন্তামণি চাষা তাহার একজন সঙ্গী চাষাকে কহিল, "অত কথায় কাজ কী, দেখো-না কেন, এ বছর যেমন ধান সস্তা হয়েছে এমন অন্য কোনো বছর হয় নি। এ বছর চাষার কপালে কী আছে কে জানে!"

বলিদান বন্ধ হইবার পরে এবং পূর্বেও যাহার যাহা কিছু ক্ষতি হইয়াছে, সর্বসম্মতিক্রমে ওই বলি বন্ধ হওয়াই তাহার একমাত্র কারণ নির্দিষ্ট হইল। এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই ভালো এইরূপ সকলের মত হইল। এ মত কিছুতেই পরিবর্তিত হইল না বটে কিন্তু দেশেই সকলে বাস করিতে লাগিল।

জয়সিংহ অন্যমনস্ক ছিলেন। ইহাদের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া তিনি মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, পূজা শেষ করিয়া রঘুপতি মন্দিরের বাহিরে বসিয়া আছেন।

দ্রুতগতি রঘুপতির নিকটে গিয়াই জয়সিংহ কাতর অথচ দৃঢ় স্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব, মায়ের আদেশ গ্রহণ করিবার জন্য আজ প্রভাতে আমি যখন মাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি কেন তাহার উত্তর দিলেন।"

রঘুপতি একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, "মা তো আমার দ্বারাই তাঁহার আদেশ প্রচার করিয়া থাকেন। তিনি নিজমুখে কিছু বলেন না।"

জয়সিংহ কহিলেন, "আপনি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন না কেন? অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া আমাকে ছলনা করিলেন কেন?"

রঘুপতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "চুপ করো। আমি কী ভাবিয়া কী করি তুমি তাহার কী বুঝিবে! বাচালের মতো যাহা মুখে আসে তাহাই

বলিয়ো না। আমি যাহা আদেশ করিব তুমি কেবল তাহাই পালন করিবে, কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়ো না।"

জয়সিংহ চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার সংশয় বাড়িল বৈ কমিল না। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "আজ প্রাতে আমি মায়ের কাছে বলিয়াছিলাম যে, তিনি যদি স্বমুখে আমাকে আদেশ না করেন তবে আমি কখনোই রাজহত্যা ঘটিতে দিব না, তাহার ব্যাঘাত করিব। যখন স্থির বুঝিলাম মা আদেশ করেন নাই তখন মহারাজের নিকট নক্ষত্ররায়ের সংকল্প প্রকাশ করিয়া দিতে হইল, তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলাম।"

রঘুপতি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। উদ্‌বেল ক্রোধ দমন করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "মন্দিরে প্রবেশ করো।"

উভয়ে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করো, বলো যে, ২৯শে আষাঢ়ের মধ্যে আমি রাজরক্ত আনিয়া এই চরণে উপহার দিব।"

জয়সিংহ ঘাড় হেঁট করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে একবার গুরুর মুখের দিকে একবার প্রতিমার মুখের দিকে চাহিলেন। প্রতিমা স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "২৯শে আষাঢ়ের মধ্যে আমি রাজরক্ত আনিয়া এই চরণে উপহার দিব।"

দশম পরিচ্ছেদ

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মহারাজ নিয়মিত রাজকার্য সমাপন করিলেন। প্রাতঃকালের সূর্যালোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে; মেঘের ছায়ায় দিন আবার অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। মহারাজ অত্যন্ত বিমনা আছেন। অন্যদিন রাজসভায় নক্ষত্ররায় উপস্থিত থাকিতেন, আজ তিনি উপস্থিত ছিলেন না। রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; তিনি ওজর করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার শরীর অসুস্থ। রাজা স্বয়ং নক্ষত্ররায়ের কক্ষে

গিয়া উপস্থিত হইলেন। নক্ষত্র মুখ তুলিয়া রাজার মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না। একখানা লিখিত কাগজ লইয়া ব্যস্ত আছেন এমনি ভাণ করিলেন। রাজা বলিলেন, "নক্ষত্র, তোমার কি অসুখ করিয়াছে?"

নক্ষত্র কাগজের এ-পিঠ ও-পিঠ উল্টাইয়া, হাতের অঙ্গুরী নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "অসুখ? না, অসুখ ঠিক নয়— এই একটুখানি কাজ ছিল— হাঁ হাঁ, অসুখ হয়েছিল— কতকটা অসুখের মতন বটে।"

নক্ষত্ররায় নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। গোবিন্দমাণিক্য অতিশয় বিষণ্ণমুখে নক্ষত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন— 'হায় হায়, স্নেহের নীড়ের মধ্যেও হিংসা ঢুকিয়াছে, সে সাপের মতো লুকাইতে চায়, মুখ দেখাইতে চায় না। আমাদের অরণ্যে কি হিংস্র পশু যথেষ্ট নাই, শেষে কি মানুষেও মানুষকে ভয় করিবে, ভাইও ভাইয়ের পাশে গিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বসিতে পাইবে না! এ সংসারে হিংসা-লোভই এত বড়ো হইয়া উঠিল, আর স্নেহ-প্রেম কোথাও ঠাঁই পাইল না! এই আমার ভাই, ইহার সহিত প্রতিদিন এক গৃহে বাস করি, একাসনে বসিয়া থাকি, হাসিমুখে কথা কই— এও আমার পাশে বসিয়া মনের মধ্যে ছুরি শানাইতেছে।' গোবিন্দমাণিক্যের নিকট তখন সংসার হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যের মতো বোধ হইতে লাগিল। ঘন অন্ধকারের মধ্যে কেবল চারি দিকে দন্ত ও নখরের ছটা দেখিতে পাইলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মহারাজ মনে করিলেন, 'এই স্নেহ-প্রেমহীন হানাহানির রাজ্যে বাঁচিয়া থাকিয়া আমি আমার স্বজাতির, আমার ভাইদের মনে কেবলই হিংসা লোভ ও দ্বেষের অনল জ্বালাইতেছি— আমার সিংহাসনের চারি দিকে আমার প্রাণাধিক আত্মীয়েরা আমার দিকে চাহিয়া মনে মনে মুখ বক্র করিতেছে, দন্ত ঘর্ষণ করিতেছে, শৃঙ্খলবদ্ধ ভীষণ কুকুরের মতো চারি দিক হইতে আমার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িবার অবসর খুঁজিতেছে। ইহা অপেক্ষা ইহাদের

খরনখরাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া, ইহাদের রক্তের তৃষা মিটাইয়া, এখান হইতে অপসৃত হওয়াই ভালো।' প্রভাত-আকাশে গোবিন্দমাণিক্য যে প্রেমচ্ছবি দেখিয়াছিলেন তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহারাজ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "নক্ষত্র, আজ অপরাহ্নে গোমতীতীরের নির্জন অরণ্যে আমরা দুই জনে বেড়াইতে যাইব।"

রাজার এই গম্ভীর আদেশবাণীর বিরুদ্ধে নক্ষত্রের মুখে কথা সরিল না, কিন্তু সংশয়ে ও আশঙ্কায় তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, মহারাজ এতক্ষণ নীরবে দুই চক্ষু তাঁহারই মনের দিকে নিবিষ্ট করিয়া বসিয়া ছিলেন— সেখানে অন্ধকার-গর্তের মধ্যে যে ভাবনাগুলো কীটের মতো কিল্‌বিল্‌ করিতেছিল সেগুলো যেন সহসা আলো দেখিয়া অস্থির হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভয়ে ভয়ে নক্ষত্ররায় রাজার মুখের দিকে একবার চাহিলেন; দেখিলেন, তাঁহার মুখে কেবল সুগভীর বিষণ্ণ শান্তির ভাব, সেখানে রোষের রেখামাত্র নাই। মানবহৃদয়ের কঠিন নিষ্ঠুরতা দেখিয়া কেবল সুগভীর শোক তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল।

বেলা পড়িয়া আসিল। তখনও মেঘ করিয়া আছে। নক্ষত্ররায়কে সঙ্গে লইয়া মহারাজ পদব্রজে অরণ্যের দিকে চলিলেন। এখনও সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে, কিন্তু মেঘের অন্ধকারে সন্ধ্যা বলিয়া ভ্রম হইতেছে— কাকেরা অরণ্যের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া অবিশ্রাম চীৎকার করিতেছে, কিন্তু দুই-একটা চিল এখনও আকাশে সাঁতার দিতেছে। দুই ভাই যখন নির্জন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন নক্ষত্ররায়ের গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। বড়ো বড়ো প্রাচীন গাছ জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে— তাহারা একটি কথা কহে না, কিন্তু স্থির হইয়া যেন কীটের পদশব্দটুকু পর্যন্তও শোনে; তাহারা কেবল নিজের ছায়ার দিকে তলস্থিত অন্ধকারের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকে। অরণ্যের

সেই জটিল রহস্যের ভিতরে পদক্ষেপ করিতে নক্ষত্ররায়ের পা যেন আর উঠে না— চারি দিকে সুগভীর নিস্তব্ধতার ভ্রূকুটি দেখিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইতে লাগিল ; নক্ষত্ররায়ের অত্যন্ত সন্দেহ ও ভয় জন্মিল ; ভীষণ অদৃষ্টের মতো নীরব রাজা এই সন্ধ্যাকালে এই পৃথিবীর অন্তরাল দিয়া তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন কিছুই ঠাহর পাইলেন না। নিশ্চয় মনে করিলেন, রাজার কাছে ধরা পড়িয়াছেন, এবং গুরুতর শাস্তি দিবার জন্যই রাজা তাঁহাকে এই অরণ্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। নক্ষত্ররায় ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাইতে পারিলে বাঁচেন, কিন্তু মনে হইল, কে যেন তাঁহার হাত-পা বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কিছুতেই আর পরিত্রাণ নাই।

অরণ্যের মধ্যস্থলে কতকটা ফাঁকা। একটি স্বাভাবিক জলাশয়ের মতো আছে, বর্ষাকালে তাহা জলে পরিপূর্ণ। সেই জলাশয়ের ধারে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রাজা বলিলেন, "দাঁড়াও।"

নক্ষত্ররায় চমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল, রাজার আদেশ শুনিয়া সেই মুহূর্তে কালের স্রোত যেন বন্ধ হইল— সেই মুহূর্তেই যেন অরণ্যের বৃক্ষগুলি যে যেখানে ছিল ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল— নীচে হইতে ধরণী এবং উপর হইতে আকাশ যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কাকের কোলাহল থামিয়া গেছে, বনের মধ্যে একটি শব্দ নাই। কেবল সেই 'দাঁড়াও' শব্দ অনেক ক্ষণ ধরিয়া যেন গম্‌গম্‌ করিতে লাগিল— সেই 'দাঁড়াও' শব্দ যেন তড়িৎপ্রবাহের মতো বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, শাখা হইতে প্রশাখায় প্রবাহিত হইতে লাগিল, অরণ্যের প্রত্যেক পাতাটা যেন সেই শব্দের কম্পনে রী রী করিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ও যেন গাছের মতোই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা তখন নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে মর্মভেদী স্থির বিষণ্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "নক্ষত্র, তুমি

আমাকে মারিতে চাও?"

নক্ষত্র বজ্রাহতের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন, উত্তর দিবার চেষ্টাও করিতে পারিলেন না।

রাজা কহিলেন, "কেন মারিবে ভাই? রাজ্যের লোভে? তুমি কি মনে কর, রাজ্য কেবল সোনার সিংহাসন, হীরার মুকুট ও রাজছত্র? এই মুকুট, এই রাজছত্র, এই রাজদণ্ডের ভার কত তাহা জান? শত-সহস্র লোকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি। রাজ্য পাইতে চাও তো সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করো, সহস্র লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ করো, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন করো— এ যে করে সেই রাজা, সে পর্ণকুটিরেই থাক্ আর প্রাসাদেই থাক্। যে ব্যক্তি সকল লোককে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে সকল লোক তো তাহারই। পৃথিবীর দুঃখহরণ যে করে সেই পৃথিবীর রাজা। পৃথিবীর রক্ত ও অর্থ শোষণ যে করে সে তো দস্যু— সহস্র অভাগার অশ্রুজল তাহার মস্তকে অহর্নিশি বর্ষিত হইতেছে, সেই অভিশাপধারা হইতে কোনো রাজছত্র তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। তাহার প্রচুর রাজভোগের মধ্যে শত শত উপবাসীর ক্ষুধা লুকাইয়া আছে, অনাথের দারিদ্র্য গলাইয়া সে সোনার অলংকার করিয়া পরে, তাহার ভূমিবিস্তৃত রাজবস্ত্রের মধ্যে শত শত শীতাতুরের মলিন ছিন্ন কন্থা আছে। রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলে না ভাই, পৃথিবীকে বশ করিয়াই রাজা হইতে হয়।"

গোবিন্দমাণিক্য থামিলেন। চারি দিকে গভীর স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

নক্ষত্ররায় মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

মহারাজ খাপ হইতে তরবারি খুলিলেন। নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "ভাই, এখানে লোক নাই, সাক্ষ্য নাই, কেহ নাই—

ভাইয়ের বক্ষে ভাই যদি ছুরি মারিতে চায় তাহার স্থান এই, সময় এই— এখানে কেহ তোমাকে নিবারণ করিবে না, কেহ তোমাকে নিন্দা করিবে না। তোমার শিরায় আর আমার শিরায় একই রক্ত বহিতেছে— একই পিতা, একই পিতামহের রক্ত— তুমি সেই রক্তপাত করিতে চাও করো, কিন্তু মনুষ্যের আবাসস্থলে করিয়ো না। কারণ, যেখানে এই রক্তের বিন্দু পড়িবে সেখানেই অলক্ষ্যে ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে। পাপের শেষ কোথায় গিয়া হয় কে জানে! পাপের একটি বীজ যেখানে পড়ে সেখানে দেখিতে দেখিতে গোপনে কেমন করিয়া সহস্র বৃক্ষ জন্মায়, কেমন করিয়া অল্পে অল্পে সুশোভন মানবসমাজ অরণ্যে পরিণত হইয়া যায় তাহা কেহ জানিতে পারে না। অতএব নগরে গ্রামে যেখানে নিশ্চিন্তচিত্তে পরম স্নেহে ভাইয়ে ভাইয়ে গলাগলি করিয়া আছে সেই ভাইদের নীড়ের মধ্যে ভাইয়ের রক্তপাত করিয়ো না। এইজন্যই তোমাকে আজ অরণ্যে ডাকিয়া আনিয়াছি।"

এই বলিয়া রাজা নক্ষত্ররায়ের হাতে তরবারি দিলেন। নক্ষত্ররায়ের হাত হইতে তরবারি ভূমিতে পড়িয়া গেল। নক্ষত্ররায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "দাদা, আমি দোষী নই— এ কথা আমার মনে কখনও উদয় হয় নাই—"

রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আমি তাহা জানি। তুমি কি কখনও আমাকে আঘাত করিতে পার— তোমাকে পাঁচ জনে মন্দ পরামর্শ দিয়াছে।"

নক্ষত্ররায় বলিলেন, "আমাকে রঘুপতি কেবল এই উপদেশ দিতেছে।"

রাজা বলিলেন, "রঘুপতির কাছ হইতে দূরে থাকিয়ো।"

নক্ষত্ররায় বলিলেন, "কোথায় যাইব বলিয়া দিন। আমি এখানে থাকিতে চাই না। আমি এখান হইতে— রঘুপতির কাছ হইতে— পালাইতে চাই।"

রাজা বলিলেন, "তুমি আমারই কাছে থাকো, আর কোথাও যাইতে হইবে না— রঘুপতি তোমার কী করিবে!"

নক্ষত্ররায় রাজার হাত দৃঢ় করিয়া ধরিলেন, রঘুপতি তাঁহাকে টানিয়া লইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্ররায় রাজার হাত ধরিয়া অরণ্যের মধ্য দিয়া যখন গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন তখনও আকাশ হইতে অল্প অল্প আলো আসিতেছিল, কিন্তু অরণ্যের নীচে অত্যন্ত অন্ধকার হইয়াছে। যেন অন্ধকারের বন্যা আসিয়াছে, কেবল গাছগুলোর মাথা উপরে জাগিয়া আছে। ক্রমে তাহাও ডুবিয়া যাইবে— তখন অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া আকাশে পৃথিবীতে এক হইয়া যাইবে।

প্রাসাদের পথে না গিয়া রাজা মন্দিরের দিকে গেলেন। মন্দিরের সন্ধ্যা-আরতি সমাপন করিয়া একটি দীপ জ্বালিয়া রঘুপতি ও জয়সিংহ কুটিরে বসিয়া আছেন। উভয়েই নীরবে আপন আপন ভাবনা লইয়া আছেন। দীপের ক্ষীণ আলোকে কেবল তাঁহাদের দুই জনের মুখের অন্ধকার দেখা যাইতেছে। নক্ষত্ররায় রঘুপতিকে দেখিয়া মুখ তুলিতে পারিলেন না; রাজার ছায়ায় দাঁড়াইয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিলেন— রাজা তাঁহাকে পাশে টানিয়া লইয়া দৃঢ়রূপে তাহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইলেন ও স্থিরনেত্রে রঘুপতির মুখের দিকে একবার চাহিলেন; রঘুপতি তীব্র দৃষ্টিতে নক্ষত্ররায়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। অবশেষে রাজা রঘুপতিকে প্রণাম করিলেন, নক্ষত্ররায়ও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। রঘুপতি প্রণাম গ্রহণ করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "জয়োস্তু— রাজ্যের কুশল?"

রাজা একটুখানি থামিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আশীর্বাদ করুন, রাজ্যের অকুশল না ঘটুক। এ রাজ্যে মায়ের সকল সন্তান যেন সম্ভাবে প্রেমে

মিলিয়া থাকে, এ রাজ্যে ভাইয়ের কাছ হইতে ভাইকে কেহ যেন কাড়িয়া না লয়, যেখানে প্রেম আছে সেখানে কেহ যেন হিংসার প্রতিষ্ঠা না করে। রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়াই আসিয়াছি। পাপ-সংকল্পের সংঘর্ষণে দাবানল জ্বলিয়া উঠিতে পারে— নির্বাণ করুন, শান্তির বারি বর্ষণ করুন, পৃথিবী শীতল করুন।"

রঘুপতি কহিলেন, "দেবতার রোষানল জ্বলিয়া উঠিলে কে তাহা নির্বাণ করিবে! এক অপরাধীর জন্য সহস্র নিরপরাধ সে অনলে দগ্ধ হয়।"

রাজা বলিলেন, "সেই তো ভয়, সেইজন্যই তো কাঁপিতেছি। সে কথা কেহ বুঝিয়াও বোঝে না কেন! আপনি কি জানেন না, এ রাজ্যে দেবতার নাম করিয়া দেবতার নিয়ম লঙ্ঘন করা হইতেছে? সেইজন্যই অমঙ্গল-আশঙ্কায় আজ সন্ধ্যাবেলায় এখানে আসিয়াছি— এখানে পাপের বৃক্ষ রোপণ করিয়া আমার এই ধনধান্যময় সুখের রাজ্যে দেবতার বজ্র আহ্বান করিয়া আনিবেন না। আপনাকে এই কথা বলিয়া গেলাম, এই কথা বলিবার জন্যই আমি আজ আসিয়াছিলাম।" বলিয়া মহারাজ রঘুপতির মুখের উপর তাঁহার মর্মভেদী দৃষ্টি স্থাপন করিলেন। রাজার সুগম্ভীর দৃঢ় স্বর রুদ্ধ ঝটিকার মতো কুটিরের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল। রঘুপতি একটি উত্তর দিলেন না, পইতা লইয়া নাড়িতে লাগিলেন। রাজা প্রণাম করিয়া নক্ষত্ররায়ের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে জয়সিংহও বাহির হইলেন। ঘরের মধ্যে কেবল একটি দীপ, রঘুপতি এবং রঘুপতির বৃহৎ ছায়া রহিল।

তখন আকাশের আলো নিবিয়া গেছে। মেঘের মধ্যে তারা নিমগ্ন। আকাশের কানায় কানায় অন্ধকার। পুবে বাতাসে সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে কোথা হইতে কদম ফুলের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে এবং অরণ্যের মর্মরশব্দ শুনা যাইতেছে। ভাবনায় নিমগ্ন হইয়া পরিচিত পথ দিয়া রাজা চলিতেছেন, সহসা পশ্চাৎ হইতে শুনিলেন কে ডাকিল "মহারাজ"।

রাজা ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

পরিচিত স্বর কহিল, "আমি আপনার অধম সেবক, আমি জয়সিংহ। মহারাজ, আপনি আমার গুরু, আমার প্রভু। আপনি ছাড়া আমার আর কেহ নাই। যেমন আপনি আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার হাত ধরিয়া অন্ধকারের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতেছেন তেমনি আমারও হাত ধরুন, আমাকেও সঙ্গে লইয়া যান। আমি গুরুতর অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়াছি। আমার কিসে ভালো হইবে, কিসে মন্দ হইবে কিছুই জানি না। আমি একবার বামে যাইতেছি, একবার দক্ষিণে যাইতেছি, আমার কর্ণধার কেহ নাই।"

সেই অন্ধকারে অশ্রু পড়িতে লাগিল, কেহ দেখিতে পাইল না, কেবল আবেগভরে জয়সিংহের আর্দ্র স্বর কাঁপিতে কাঁপিতে রাজার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। স্তব্ধস্থির অন্ধকার বায়ুচঞ্চল সমুদ্রের মতো কাঁপিতে লাগিল। রাজা জয়সিংহের হাত ধরিয়া বলিলেন, "চলো, আমার সঙ্গে প্রাসাদে চলো।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিন যখন জয়সিংহ মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন তখন পূজার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। রঘুপতি বিমর্ষমুখে একাকী বসিয়া আছেন। ইহার পূর্বে কখনও এরূপ অনিয়ম হয় নাই।

জয়সিংহ আসিয়া গুরুর কাছে না গিয়া তাঁহার বাগানের মধ্যে গেলেন। তাঁহার গাছপালাগুলির মধ্যে গিয়া বসিলেন। তাহারা তাঁহার চারি দিকে কাঁপিতে লাগিল, নড়িতে লাগিল, ছায়া নাচাইতে লাগিল। তাঁহার চারি দিকে পুষ্পখচিত পল্লবের স্তর, শ্যামল স্তরের উপর স্তর, ছায়াপূর্ণ সুকোমল স্নেহের আচ্ছাদন, সুমধুর আহ্বান, প্রকৃতির প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন। এখানে সকলে অপেক্ষা করিয়া থাকে— কথা জিজ্ঞাসা করে না, ভাবনার ব্যাঘাত করে না, চাহিলে তবে চায়, কথা

কহিলে তবে কথা কয়। এই নীরব শুশ্রূষার মধ্যে, প্রকৃতির এই অন্তঃপুরের মধ্যে বসিয়া জয়সিংহ ভাবিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাকে যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় ধীরে ধীরে রঘুপতি আসিয়া তাঁহার পিঠে হাত দিলেন। জয়সিংহ সচকিত হইয়া উঠিলেন। রঘুপতি তাঁহার পাশে বসিলেন। জয়সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিতস্বরে কহিলেন, "বৎস, তোমার এমন ভাব দেখিতেছি কেন? আমি তোমার কী করিয়াছি যে, তুমি অল্পে অল্পে আমার কাছ হইতে সরিয়া যাইতেছ?"

জয়সিংহ কী বলিতে চেষ্টা করিলেন, রঘুপতি তাহাতে বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন, "এক মুহূর্তের জন্য কি আমার স্নেহের অভাব দেখিয়াছ? আমি কি তোমার কাছে কোনো অপরাধ করিয়াছি জয়সিংহ? যদি করিয়া থাকি তবে আমি তোমার গুরু, তোমার পিতৃতুল্য, আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছি, আমাকে মার্জনা করো।"

জয়সিংহ বজ্রাহাতের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন, গুরুর চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, বলিলেন, "পিতা, আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, আমি কোথায় যাইতেছি দেখিতে পাইতেছি না।"

রঘুপতি জয়সিংহের হাত ধরিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি তোমাকে তোমার শৈশব হইতে মাতার ন্যায় স্নেহে পালন করিয়াছি, পিতার অধিক যত্নে শাস্ত্রশিক্ষা দিয়াছি, তোমার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সখার ন্যায় তোমাকে আমার সমুদয় মন্ত্রণার সহযোগী করিয়াছি। আজ তোমাকে কে আমার পাশ হইতে টানিয়া লইতেছে— এতদিনকার স্নেহমমতার বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে? তোমার উপর আমার যে দেবদত্ত অধিকার জন্মিয়াছে সে পবিত্র অধিকারে কে হস্তক্ষেপ করিয়াছে? বলো বৎস, সেই মহাপাতকীর নাম বলো।"

জয়সিংহ বলিলেন, "প্রভু, আপনার কাছ হইতে আমাকে কেহ

বিচ্ছিন্ন করে নাই—আপনিই আমাকে দূর করিয়া দিয়াছেন। আমি ছিলাম গৃহের মধ্যে, আপনি সহসা আমাকে পথের মধ্যে বাহির করিয়া দিয়াছেন। আপনি বলিয়াছেন, কেই বা পিতা, কেই বা মাতা, কেই বা ভ্রাতা। আপনি বলিয়াছেন, পৃথিবীতে কোনো বন্ধন নাই, স্নেহ-প্রেমের পবিত্র অধিকার নাই। যাহাকে মা বলিয়া জানিতাম আপনি তাঁহাকে বলিয়াছেন শক্তি। যে যেখানে হিংসা করিতেছে, যে যেখানে রক্তপাত করিতেছে, যেখানেই ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, যেখানেই দুইজন মানুষে যুদ্ধ, সেইখানেই এই তৃষিত শক্তি রক্তলালসায় তাঁহার খর্পর লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আপনি মায়ের কোল হইতে আমাকে এ কী রাক্ষসীর দেশে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছেন!"

রঘুপতি অনেক ক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তবে তুমি স্বাধীন হইলে, বন্ধনমুক্ত হইলে, তোমার উপর হইতে আমার সমস্ত অধিকার আমি প্রত্যাহরণ করিলাম, তাহাতেই যদি তুমি সুখী হও তবে তাই হউক।" বলিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিলেন।

জয়সিংহ তাঁহার পা ধরিয়া বলিলেন, "না না না, প্রভু, আপনি আমাকে ত্যাগ করিলেও আমি আপনাকে ত্যাগ করিতে পারি না। আমি রহিলাম— আপনার পদতলেই রহিলাম, আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন। আপনার পথ ছাড়া আমার অন্য পথ নাই।"

রঘুপতি তখন জয়সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন, তাঁহার অশ্রু প্রবাহিত হইয়া জয়সিংহের স্কন্ধে পড়িতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মন্দিরে অনেক লোক জমা হইয়াছে। খুব কোলাহল উঠিয়াছে। রঘুপতি রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কী করিতে আসিয়াছ?"

তাহারা নানা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমরা ঠাকরুন-দর্শন করিতে আসিয়াছি।"

রঘুপতি বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকরুন কোথায়! ঠাকরুন এ রাজ্য থেকে চলে গেছেন। তোরা ঠাকরুনকে রাখতে পারলি কই! তিনি চলে গেছেন।"

ভারী গোলমাল উঠিল— নানা দিক হইতে নানা কথা শুনা যাইতে লাগিল।

"সে কী কথা ঠাকুর?"

"আমরা কী অপরাধ করেছি ঠাকুর?"

"মা কি কিছুতেই প্রসন্ন হবেন না?"

"আমার ভাইপোর ব্যামো ছিল বলে আমি ক'দিন পুজো দিতে আসি নি।"— তার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারই উপেক্ষা সহিতে না পারিয়া দেবী দেশ ছাড়িতেছেন।

"আমার পাঁঠা দুটি ঠাকরুনকে দেব মনে করেছিলুম, বিস্তর দূর বলে আসতে পারি নি।"—দুটো পাঁঠা দিতে দেরি করিয়া রাজ্যের যে এরূপ অমঙ্গল ঘটিল, ইহাই মনে করিয়া সে কাতর হইতেছিল।

"গোবর্ধন যা মানত করেছিল তা মাকে দেয় নি বটে, কিন্তু মাওতো তেমনি তাকে শাস্তি দিয়েছেন। তার পিলে বেড়ে ঢাক হয়েছে, সে আজ ছ'মাস বিছানায় প'ড়ে।"— গোবর্ধন তাহার প্লীহার আতিশয্য লইয়া চুলায় যাক্,মা দেশে থাকুন,এইরূপ সে মনে মনে প্রার্থনা করিল। সকলেই অভাগা গোবর্ধনের প্লীহার প্রচুর উন্নতিকামনা করিতে লাগিল।

ভিড়ের মধ্যে একটি দীর্ঘ লোক ছিল, সে সকলকে ধমক দিয়া থামাইল এবং রঘুপতিকে জোড়হস্তে কহিল, "ঠাকুর, মা কেন চলিয়া গেলেন, আমাদের কী অপরাধ হইয়াছিল?"

রঘুপতি কহিলেন, "তোরা মায়ের জন্য এক ফোঁটা রক্ত দিতে পারিস নে, এই তো তোদের ভক্তি!"

সকলে চুপ করিয়া রহিল। অবশেষে কথা উঠিতে লাগিল। অস্পষ্ট স্বরে কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "রাজার নিষেধ, আমরা কী করিব!"

জয়সিংহ প্রস্তরের পুত্তলিকার মতো স্থির হইয়া বসিয়া ছিলেন। 'মায়ের নিষেধ' এই কথা তড়িদ্‌বেগে তাঁহার রসনাগ্রে উঠিয়াছিল— কিন্তু তিনি আপনাকে দমন করিলেন, একটি কথা কহিলেন না।

রঘুপতি তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "রাজা কে! মায়ের সিংহাসন কি রাজার সিংহাসনের নীচে! তবে এই মাতৃহীন দেশে তোদের রাজাকে লইয়াই তোরা থাক্। দেখি তোদের কে রক্ষা করে!"

জনতার মধ্যে গুন্ গুন্ শব্দ উঠিল। সকলেই সাবধানে কথা কহিতে লাগিল।

রঘুপতি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "রাজাকেই বড়ো করিয়া লইয়া তোদের মাকে তোরা রাজ্য হইতে অপমান করিয়া বিদায় করিলি! সুখে থাকিবি মনে করিস নে। আর তিন বৎসর পরে এত বড়ো রাজ্যে তোদের ভিটের চিহ্ন থাকিবে না— তোদের বংশে বাতি দিবার কেহ থাকিবে না।"

জনতার মধ্যে সাগরের গুন্ গুন্ শব্দ ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল। জনতাও ক্রমে বাড়িতেছে। সেই দীর্ঘ লোকটি জোড়হাত করিয়া রঘুপতিকে কহিল, "সন্তান যদি অপরাধ করে থাকে তবে মা তাকে শাস্তি দিন; কিন্তু মা সন্তানকে একেবারে পরিত্যাগ করে যাবেন একি কখনো হয়! প্রভু, ব'লে দিন কী করলে মা ফিরে আসবেন।"

রঘুপতি কহিলেন, "তোদের এই রাজা যখন এ রাজ্য হইতে বাহির হইয়া যাইবেন মাও তখন এই রাজ্যে পুনর্বার পদার্পণ করিবেন।"

এই কথা শুনিয়া জনতার গুন্ গুন্ শব্দ হঠাৎ থামিয়া গেল। হঠাৎ চতুর্দিক সুগভীর নিস্তব্ধ হইয়া গেল, অবশেষে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল; কেহ সাহস করিয়া কথা কহিতে পারিল না।

রঘুপতি মেঘগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তবে তোরা দেখিবি ? আয় আমার সঙ্গে আয়। অনেক দূর হতে অনেক আশা করিয়া তোরা ঠাকরুনকে দর্শন করিতে আসিয়াছিস— চল্, একবার মন্দিরে চল্।"

সকলে সভয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া সমবেত হইল। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ ছিল ; রঘুপতি ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্তি হইল না। প্রতিমার মুখ দেখা যাইতেছে না, প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ দর্শকের দিকে স্থাপিত। মা বিমুখ হইয়াছেন। সহসা জনতার মধ্য হইতে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল, "একবার ফিরে দাঁড়া মা ! আমরা কী অপরাধ করেছি ?" চারি দিকে "মা কোথায়" "মা কোথায়" রব উঠিল। প্রতিমা পাষাণ বলিয়াই ফিরিল না। অনেকে মূর্ছা গেল। ছেলেরা কিছু না বুঝিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বৃদ্ধেরা মাতৃহারা শিশুসন্তানের মতো ডাকিতে লাগিল, "মা, ওমা !" স্ত্রীলোকদের ঘোমটা খুলিয়া গেল, অঞ্চল খসিয়া পড়িল, তাহারা বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। যুবকেরা কম্পিত ঊর্ধ্বস্বরে বলিতে লাগিল, "মা, তোকে আমরা ফিরিয়ে আনব ; তোকে আমরা ছাড়ব না।" একজন পাগল গাহিয়া উঠিল—

("মা আমার পাষাণের মেয়ে
সন্তানে দেখলি নে চেয়ে।")

মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সমস্ত রাজ্য যেন "মা মা" করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, কিন্তু প্রতিমা ফিরিল না। মধ্যাহ্নের সূর্য প্রখর হইয়া উঠিল, প্রাঙ্গণে উপবাসী জনতার বিলাপ থামিল না।

তখন জয়সিংহ কম্পিত পদে আসিয়া রঘুপতিকে কহিলেন, "প্রভু, আমি কি একটি কথাও কহিতে পাইব না ?"

রঘুপতি কহিলেন, "না, একটি কথাও না।"

জয়সিংহ কহিলেন, "সন্দেহের কি কোনো কারণ নাই ?"

রঘুপতি দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "না।"

জয়সিংহ দৃঢ়রূপে মুষ্টি বদ্ধ করিয়া কহিলেন, "সমস্তই কি বিশ্বাস করিব?"

রঘুপতি জয়সিংহকে সুতীব্র দৃষ্টি-দ্বারা দগ্ধ করিয়া কহিলেন, "হাঁ।"

জয়সিংহ বক্ষে হাত দিয়া কহিলেন, "আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।" তিনি জনতার মধ্য হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

IMP.

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিন ২৯শে আষাঢ়। আজ রাত্রে চতুর্দশ দেবতার পূজা। আজ প্রভাতে, তালবনের আড়ালে সূর্য যখন উঠিতেছে তখন পূর্ব দিকে মেঘ নাই। কনককিরণপ্লাবিত আনন্দমগ্ন কাননের মধ্যে গিয়া জয়সিংহ যখন বসিলেন তখন তাঁহার পুরাতন স্মৃতিসকল মনে উঠিতে লাগিল। এই বনের মধ্যে, এই পাষাণমন্দিরের পাষাণসোপানাবলীর মধ্যে, এই গোমতীতীরে, সেই বৃহৎ বটের ছায়ায় সেই ছায়া দিয়া ঘেরা পুকুরের ধারে তাঁহার বাল্যকাল— সুমধুর স্বপ্নের মতো মনে পড়িতে লাগিল। যে-সকল মধুর দৃশ্য তাঁহার বাল্যকালকে সস্নেহে ঘিরিয়া থাকিত তাহারা আজ হাসিতেছে, তাঁহাকে আবার আহ্বান করিতেছে; কিন্তু তাঁহার মন বলিতেছে, 'আমি যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি, আমি বিদায় লইয়াছি, আমি আর ফিরিব না।' শ্বেত পাষাণের মন্দিরের উপরে সূর্যকিরণ পড়িয়াছে এবং তাহার বাম দিকের ভিত্তিতে বকুলশাখার কম্পিত ছায়া পড়িয়াছে। ছেলেবেলায় এই পাষাণ মন্দিরকে যেমন সচেতন বোধ হইত, এই সোপানের মধ্যে একলা বসিয়া যখন খেলা করিতেন, তখন এই সোপানগুলির মধ্যে যেমন সঙ্গ পাইতেন, আজ প্রভাতের সূর্যকিরণে মন্দিরকে তেমনি সচেতন, তাহার সোপানগুলিকে তেমনি শৈশবের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন,

মন্দিরের ভিতরে মাকে আজ আবার মা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু অভিমানে তাঁহার হৃদয় পূরিয়া গেল, তাঁহার দুই চক্ষু ভাসিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রঘুপতিকে আসিতে দেখিয়া জয়সিংহ চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন। গুরুকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুপতি কহিলেন, "আজ পূজার দিন। মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া কী শপথ করিয়াছিলে মনে আছে?"

জয়সিংহ কহিলেন, "আছে।"

রঘুপতি। শপথ পালন করিবে তো?

জয়সিংহ। হাঁ।

রঘুপতি। দেখিয়ো, বৎস, সাবধানে কাজ করিয়ো। বিপদের আশঙ্কা আছে। আমি তোমাকে রক্ষা করিবার জন্যই প্রজাদিগকে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছি।

জয়সিংহ চুপ করিয়া রঘুপতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিছুই উত্তর করিলেন না। রঘুপতি তাঁহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "আমার আশীর্বাদে নির্বিঘ্নে তুমি তোমার কার্য সাধন করিতে পারিবে, মায়ের আদেশ পালন করিতে পারিবে।" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

অপরাহ্নে একটি ঘরে বসিয়া রাজা ধ্রুবের সহিত খেলা করিতেছেন। ধ্রুবের আদেশমতে একবার মাথার মুকুট খুলিতেছেন, একবার পরিতেছেন; ধ্রুব মহারাজের এই দুর্দশা দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইতেছে। রাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমি অভ্যাস করিতেছি। তাঁহার আদেশে এ মুকুট যেমন সহজে পরিতে পারিয়াছি তাঁহার আদেশে এ মুকুট যেন তেমনি সহজে খুলিতে পারি। মুকুট পরা শক্ত, কিন্তু মুকুট ত্যাগ করা আরও কঠিন।"

ধ্রুবের মনে সহসা একটা ভাবোদয় হইল— কিয়ৎক্ষণ রাজার মুখের দিকে চাহিয়া মুখে আঙুল দিয়া বলিল, "তুমি আজা।" রাজা শব্দ

হইতে 'র' অক্ষর একেবারে সমূলে লোপ করিয়া দিয়াও ধ্রুবের মনে কিছুমাত্র অনুতাপের উদয় হইল না। রাজার মুখের সামনে রাজাকে আজা বলিয়া সে সম্পূর্ণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিল।

রাজা ধ্রুবের এই ধৃষ্টতা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, "তুমি আজা।"

ধ্রুব বলিল, "তুমি আজা।"

এ বিষয়ে তর্কের শেষ হইল না। কোনো পক্ষে কোনো প্রমাণ নাই, তর্ক কেবলই গায়ের জোরে। অবশেষে রাজা নিজের মুকুট লইয়া ধ্রুবের মাথায় চড়াইয়া দিলেন। তখন ধ্রুবের আর কথাটি কহিবার জো রহিল না, সম্পূর্ণ হার হইল— ধ্রুবের মুখের আধখানা সেই মুকুটের নীচে ডুবিয়া গেল। মুকুট-সমেত মস্ত মাথা দুলাইয়া ধ্রুব মুকুটহীন রাজার প্রতি আদেশ করিল, "একটা গল্প বলো।"

রাজা বলিলেন, "কী গল্প বলিব?"

ধ্রুব কহিল, "দিদির গল্প বলো।" গল্পমাত্রকেই ধ্রুব দিদির গল্প বলিয়া জানিত। সে জানিত, দিদি যে-সকল গল্প বলিত তাহা ছাড়া পৃথিবীতে আর গল্প নাই।

রাজা তখন মস্ত এক পৌরাণিক গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "হিরণ্যকশিপু নামে এক রাজা ছিল।"

রাজা শুনিয়া ধ্রুব বলিয়া উঠিল, "আমি আজা।" মস্ত ঢিলে মুকুটের জোরে হিরণ্যকশিপুর রাজপদ সে একেবারে অগ্রাহ্য করিল।

চাটুভাষী সভাসদের ন্যায় গোবিন্দমাণিক্য সেই কিরীটী শিশুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিলেন, "তুমিও আজা, সেও আজা।"

ধ্রুব তাহাতেও সুস্পষ্ট অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল, "না, আমি আজা।"

অবশেষে মহারাজ যখন বলিলেন "হিরণ্যকশিপু আজা নয়, সে আক্কস", তখন ধ্রুব তাহাতে আপত্তি করিবার কিছুই দেখিল না।

এমন সময় নক্ষত্ররায় গৃহে প্রবেশ করিলেন ; কহিলেন, "শুনিলাম, রাজকার্যোপলক্ষে মহারাজ আমাকে ডাকিয়াছেন। আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি।"

রাজা কহিলেন, "আর-একটু অপেক্ষা করো, গল্পটা শেষ করিয়া লই।" বলিয়া গল্পটা সমস্ত শেষ করিলেন। "আক্কস দুষ্টু"— গল্প শুনিয়া সংক্ষেপে ধ্রুব এইরূপ মত প্রকাশ করিল।

ধ্রুবের মাথায় মুকুট দেখিয়া নক্ষত্ররায়ের ভালো লাগে নাই। ধ্রুব যখন দেখিল নক্ষত্ররায়ের দৃষ্টি তাহার দিকে স্থাপিত রহিয়াছে তখন সে নক্ষত্ররায়কে গম্ভীরভাবে জানাইয়া দিল, "আমি আজা।"

নক্ষত্র বলিলেন, "ছি, ও কথা বলিতে নাই।" বলিয়া ধ্রুবের মাথা হইতে মুকুট তুলিয়া লইয়া রাজার হাতে দিতে উদ্যত হইলেন। ধ্রুব মুকুটহরণের সম্ভাবনা দেখিয়া সত্যকার রাজাদের মতো চীৎকার করিয়া উঠিল। গোবিন্দমাণিক্য তাহাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন, নক্ষত্রকে নিবারণ করিলেন।

অবশেষে গোবিন্দমাণিক্য নক্ষত্ররায়কে কহিলেন, "শুনিয়াছি রঘুপতি ঠাকুর অসৎ উপায়ে প্রজাদের অসন্তোষ উদ্রেক করিয়া দিতেছেন। তুমি স্বয়ং নগরের মধ্যে গিয়া এ বিষয়ে তদারক করিয়া আসিবে এবং সত্য মিথ্যা অবধারণ করিয়া আমাকে জানাইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "যে আজ্ঞে।" বলিয়া চলিয়া গেলেন— কিন্তু ধ্রুবের মাথায় মুকুট তাঁহার কিছুতেই ভালো লাগিল না।

প্রহরী আসিয়া কহিল,"পুরোহিত-ঠাকুরের সেবক জয়সিংহ সাক্ষাৎ-প্রার্থনায় দ্বারে দাঁড়াইয়া।"

রাজা তাহাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

জয়সিংহ মহারাজকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে কহিলেন, "মহারাজ, আমি বহুদূরদেশে চলিয়া যাইতেছি। আপনি আমার রাজা, আমার গুরু,

আপনার আশীর্বাদ লইতে আসিয়াছি।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইবে জয়সিংহ?"

জয়সিংহ বলিলেন, "জানি না মহারাজ! কোথায় তাহা কেহ বলিতে পারে না।" রাজা কথা কহিতে উদ্যত দেখিয়া জয়সিংহ কহিলেন, "নিষেধ করিবেন না মহারাজ! আপনি নিষেধ করিলে আমার যাত্রা শুভ হইবে না। আশীর্বাদ করুন, এখানে আমার যে-সকল সংশয় ছিল সেখানে যেন সে-সকল সংশয় দূর হইয়া যায়। এখানকার মেঘ সেখানে যেন কাটিয়া যায়। যেন আপনার মতো রাজার রাজত্বে যাই, যেন শান্তি পাই।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে যাইবে?"

জয়সিংহ কহিলেন, "আজ সন্ধ্যাকালে। অধিক সময় নাই মহারাজ, আজ আমি তবে বিদায় হই।" বলিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া রাজার পদধূলি লইলেন, রাজার চরণে দুই ফোঁটা অশ্রু পড়িল।

জয়সিংহ উঠিয়া যখন যাইতে উদ্যত হইলেন তখন ধ্রুব ধীরে ধীরে গিয়া তাঁহার কাপড় টানিয়া কহিল, "তুমি যেয়ো না।"

জয়সিংহ হাসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া কহিলেন, "কার কাছে থাকিব বৎস? আমার কে আছে?"

ধ্রুব কহিল, "আমি আজা।"

জয়সিংহ কহিলেন, "তোমরা রাজার রাজা, তোমরাই সকলকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ।" ধ্রুবকে কোল হইতে নামাইয়া জয়সিংহ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মহারাজ গম্ভীরমুখে অনেক ক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

চতুর্দশী তিথি। মেঘও করিয়াছে, চাঁদও উঠিয়াছে। আকাশের কোথাও আলো কোথাও অন্ধকার। কখনো চাঁদ বাহির হইতেছে কখনো চাঁদ লুকাইতেছে। গোমতীতীরের অরণ্যগুলি চাঁদের দিকে চাহিয়া তাহাদের গভীর অন্ধকাররাশির মর্ম ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে নিশ্বাস ফেলিতেছে।

আজ রাত্রে পথে লোক বাহির হওয়া নিষেধ। রাত্রে পথে লোক কেই-বা বাহির হয়। কিন্তু নিষেধ আছে বলিয়া পথের বিজনতা আজ আরও গভীর বোধ হইতেছে। নগরবাসীরা সকলেই আপনার ঘরের দীপ নিবাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। পথে একটি প্রহরী নাই। চোরও আজ পথে বাহির হয় না। যাহারা শ্মশানে শবদাহ করিতে যাইবে তাহারা মৃতদেহ ঘরে লইয়া প্রভাতের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। ঘরে যাহাদের সন্তান মুমূর্ষু তাহারা বৈদ্য ডাকিতে বাহির হয় না। যে ভিক্ষুক পথপ্রান্তে বৃক্ষতলে শয়ন করিত সে আজ গৃহস্থের গোশালায় আশ্রয় লইয়াছে।

সে রাত্রে শৃগাল কুকুর নগরের পথে পথে বিচরণ করিতেছে, দুই-একটা চিতাবাঘ গৃহস্থের দ্বারের কাছে আসিয়া উঁকি মারিতেছে। মানুষের মধ্যে কেবল একজন মাত্র আজ গৃহের বাহিরে আছে— আর মানুষ নাই। সে একখানা ছুরি লইয়া নদীতীরে পাথরের উপর শান দিতেছে, এবং অন্যমনস্ক হইয়া কী ভাবিতেছে। ছুরির ধার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সে বোধ করি ছুরির সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাতেও শান দিতেছিল, তাই তার শান দেওয়া আর শেষ হইতেছিল না। প্রস্তরের ঘর্ষণে তীক্ষ্ণ ছুরি হিস্ হিস্ শব্দ করিয়া হিংসার লালসায় তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার নদী বহিয়া যাইতেছিল। জগতের উপর দিয়া

অন্ধকার রজনীর প্রহর বহিয়া যাইতেছিল। আকাশের উপর দিয়া অন্ধকারঘন মেঘের স্রোত ভাসিয়া যাইতেছিল।

অবশেষে যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল তখন জয়সিংহের চেতনা হইল। তপ্ত ছুরি খাপের মধ্যে পুরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পূজার সময় নিকটবর্তী হইয়াছে। তাঁহার শপথের কথা মনে পড়িয়াছে। আর এক দণ্ডও বিলম্ব করিলে চলিবে না।

মন্দির আজ সহস্র দীপে আলোকিত। ত্রয়োদশ দেবতার মাঝখানে কালী দাঁড়াইয়া নররক্তের জন্য জিহ্বা মেলিয়াছেন। মন্দিরের সেবক-দিগকে বিদায় করিয়া দিয়া চতুর্দশ দেবপ্রতিমা সম্মুখে করিয়া রঘুপতি একাকী মন্দিরে বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে এক দীর্ঘ খাঁড়া। উলঙ্গ উজ্জ্বল খড়্গ দীপালোকে বিভাসিত হইয়া স্থির বজ্রের ন্যায় দেবীর আদেশের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

অর্ধরাত্রে পূজা। সময় নিকটবর্তী। রঘুপতি অত্যন্ত অস্থিরচিত্তে জয়সিংহের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। সহসা ঝড়ের মতো বাতাস উঠিয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। বাতাসে মন্দিরের সহস্র দীপশিখা কাঁপিতে লাগিল, উলঙ্গ খড়্গের উপর বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। চতুর্দশ দেবতা ও রঘুপতির ছায়া যেন জীবন পাইয়া দীপশিখার নৃত্যের তালে তালে মন্দিরের ভিত্তিময় নাচিতে লাগিল। একটা নরকপাল ঝড়ের বাতাসে ঘরময় গড়াইতে লাগিল। মন্দিরের মধ্যে দুইটা চামচিকা আসিয়া শুষ্ক পত্রের মতো ক্রমাগত উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল—দেয়ালে তাহাদের ছায়া উড়িতে লাগিল।

দ্বিপ্রহর হইল। প্রথমে নিকটে, পরে দূর-দূরান্তরে, শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। ঝড়ের বাতাসও তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পূজার সময় আসিয়াছে। রঘুপতি অমঙ্গল-আশঙ্কায় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন।

এমন সময় জীবন্ত ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুতের মতো জয়সিংহ নিশীথের অন্ধকারের মধ্য হইতে সহসা মন্দিরের আলোকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দীর্ঘ চাদরে দেহ আচ্ছাদিত, সর্বাঙ্গ বাহিয়া বৃষ্টিধারা পড়িতেছে, নিশ্বাস বেগে বহিতেছে, চক্ষুতারকায় অগ্নিকণা জ্বলিতেছে।

রঘুপতি তাঁহাকে ধরিয়া কানের কাছে মুখ দিয়া কহিলেন, "রাজরক্ত আনিয়াছ?"

জয়সিংহ, তাঁহার হাত ছাড়াইয়া উচ্চস্বরে কহিলেন, "আনিয়াছি। রাজরক্ত আনিয়াছি! আপনি সরিয়া দাঁড়ান, আমি দেবীকে নিবেদন করি।" শব্দে মন্দির কাঁপিয়া উঠিল।

কালীর প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "সত্যই কি তবে তুই সন্তানের রক্ত চাস মা! রাজরক্ত নহিলে তোর তৃষা মিটিবে না! জন্মাবধি আমি তোকেই মা বলিয়া আসিয়াছি, আমি তোরই সেবা করিয়াছি, আমি আর-কাহারো দিকে চাই নাই, আমার জীবনের আর-কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। আমি রাজপুত, আমি ক্ষত্রিয়, আমার প্রপিতামহ রাজা ছিলেন, আমার মাতামহবংশীয়েরা আজও রাজত্ব করিতেছেন। এই নে তবে তোর সন্তানের রক্ত, তোর রাজরক্ত এই নে।" গাত্র হইতে চাদর পড়িয়া গেল। কটিবন্ধ হইতে ছুরি বাহির করিলেন— বিদ্যুৎ নাচিয়া উঠিল— চকিতের মধ্যে সেই ছুরি আমূল তাঁহার হৃদয়ে নিহিত করিলেন, (মরণের তীক্ষ্ণ জিহ্বা তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল।) প্রতিমার পদতলে পড়িয়া গেলেন; পাষাণপ্রতিমা বিচলিত হইল না।

রঘুপতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন— জয়সিংহকে তুলিবার চেষ্টা করিলেন, তুলিতে পারিলেন না। তাঁহার মৃতদেহের উপর পড়িয়া রহিলেন। রক্ত গড়াইয়া মন্দিরের শ্বেতপ্রস্তরের উপর প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে দীপগুলি একে একে নিবিয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত রাত্রি একটি প্রাণীর নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। রাত্রি তৃতীয়

প্রহরের সময় ঝড় থামিয়া চারি দিক নিস্তব্ধ হইয়া গেল। রাত্রি চতুর্থ প্রহরের সময় মেঘের ছিদ্র দিয়া চন্দ্রালোক মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। চন্দ্রালোক জয়সিংহের পাণ্ডুবর্ণ মুখের উপর পড়িল, চতুর্দশ দেবতা শিয়রে দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। প্রভাতে বন হইতে যখন পাখি ডাকিয়া উঠিল তখন রঘুপতি মৃতদেহ ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রাজার আদেশমত প্রজাদের অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধানের জন্য নক্ষত্ররায় স্বয়ং প্রাতঃকালে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার ভাবনা হইতে লাগিল 'মন্দিরে কী করিয়া যাই'। রঘুপতির সম্মুখে পড়িলে তিনি কেমন অস্থির হইয়া পড়েন, আত্মসম্বরণ করিতে পারেন না। রঘুপতির সম্মুখে পড়িতে তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। এই জন্য তিনি স্থির করিয়াছেন, রঘুপতির দৃষ্টি এড়াইয়া গোপনে জয়সিংহের কক্ষে গিয়া তাঁহার নিকট হইতে সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

নক্ষত্ররায় ধীরে ধীরে জয়সিংহের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই মনে করিলেন, ফিরিতে পারিলে বাঁচি। দেখিলেন, জয়সিংহের পুঁথি, তাঁহার বসন, তাঁহার গৃহসজ্জা, চারি দিকে ছড়ানো রহিয়াছে; মাঝখানে রঘুপতি বসিয়া। জয়সিংহ নাই। রঘুপতির লোহিত চক্ষু অঙ্গারের ন্যায় জ্বলিতেছে, তাঁহার কেশপাশ বিশৃঙ্খল। তিনি নক্ষত্ররায়কে দেখিয়াই দৃঢ় মুষ্টিতে তাঁহার হাত ধরিলেন। বলপূর্বক তাঁহাকে মাটিতে বসাইলেন। নক্ষত্ররায়ের প্রাণ উড়িয়া গেল। রঘুপতি তাঁহার অঙ্গারনয়নে নক্ষত্ররায়ের মর্মস্থান পর্যন্ত দগ্ধ করিয়া পাগলের মতো বলিলেন, "রক্ত কোথায়?" নক্ষত্ররায়ের হৃৎপিণ্ডে রক্তের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, মুখ দিয়া কথা সরিল না।

রঘুপতি উচ্চস্বরে বলিলেন, "তোমার প্রতিজ্ঞা কোথায়? রক্ত কোথায়?"

নক্ষত্ররায় হাত নাড়িলেন, পা নাড়িলেন, বামে সরিয়া বসিলেন, কাপড়ের প্রান্ত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, তাঁহার ঘর্ম বহিতে লাগিল, তিনি শুষ্কমুখে বলিলেন, "ঠাকুর—"

রঘুপতি কহিলেন, "এবার মা যে স্বয়ং খড়্গ তুলিয়াছেন, এবার চারি দিকে যে রক্তের স্রোত বহিতে থাকিবে, এবার তোমাদের বংশে এক-ফোঁটা রক্ত যে বাকি থাকিবে না! তখন দেখিব নক্ষত্ররায়ের ভ্রাতৃস্নেহ।"

"ভ্রাতৃস্নেহ! হাঃ হাঃ হাঃ! ঠাকুর"— নক্ষত্ররায়ের হাসি আর বাহির হইল না, গলা শুকাইয়া গেল।

রঘুপতি কহিলেন, "আমি গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত চাই না। পৃথিবীতে গোবিন্দমাণিক্যের যে প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় আমি তাহাকেই চাই। তাহার রক্ত লইয়া আমি গোবিন্দমাণিক্যের গায়ে মাখাইতে চাই— তাহার বক্ষঃস্থল রক্তবর্ণ হইয়া যাইবে— সে রক্তের চিহ্ন কিছুতেই মুছিবে না। এই দেখো— চাহিয়া দেখো।" বলিয়া উত্তরীয় মোচন করিলেন, তাঁহার দেহ রক্তে লিপ্ত, তাঁহার বক্ষোদেশে স্থানে স্থানে রক্ত জমিয়া আছে।

নক্ষত্ররায় শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাত-পা কাঁপিতে লাগিল। রঘুপতি বজ্রমুষ্টিতে নক্ষত্ররায়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "সে কে? কে গোবিন্দমাণিক্যের প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়? কে চলিয়া গেলে গোবিন্দমাণিক্যের চক্ষে পৃথিবী শ্মশান হইয়া যাইবে, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য চলিয়া যাইবে? সকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই কাহার মুখ তাঁহার মনে পড়ে, কাহার স্মৃতি সঙ্গে করিয়া তিনি রাত্রে শয়ন করিতে যান, তাঁহার হৃদয়ের নীড় পরিপূর্ণ করিয়া কে বিরাজ করিতেছে? সে কে? সে কি তুমি?" বলিয়া, ব্যাঘ্র লম্ফ দিবার পূর্বে কম্পিত

হরিণশিশুর দিকে যেমন একদৃষ্টিতে চায় রঘুপতি তেমনি নক্ষত্রের দিকে চাহিলেন।

নক্ষত্ররায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "না, আমি না।" কিন্তু কিছুতেই রঘুপতির মুষ্টি ছাড়াইতে পারিলেন না।

রঘুপতি বলিলেন, "তবে বলো সে কে ?"

নক্ষত্ররায় বলিয়া ফেলিলেন, "সে ধ্রুব।"

রঘুপতি বলিলেন, "ধ্রুব কে ?"

নক্ষত্ররায়। সে একটি শিশু—

রপঘুতি বলিলেন, "আমি জানি, তাহাকে জানি। রাজার নিজের সন্তান নাই, তাহাকেই সন্তানের মতো পালন করিতেছেন। নিজের সন্তানকে লোকে কেমন ভালোবাসে জানি না, কিন্তু পালিত সন্তানকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসে তাহা জানি। আপনার সমুদয় সম্পদের চেয়ে তাহার সুখ রাজার বেশি মনে হয়। আপনার মাথায় মুকুটের চেয়ে তাহার মাথায় মুকুট দেখিলে রাজার বেশি আনন্দ হয়।"

নক্ষত্ররায় আশ্চর্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক কথা।"

রঘুপতি কহিলেন, "ঠিক কথা নয় তো কী ? রাজা তাহাকে কতখানি ভালোবাসেন তাহা কি আমি জানি না ? আমি কি বুঝিতে পারি না ? আমি তো তাহাকেই চাই।"

নক্ষত্ররায় হাঁ করিয়া রঘুপতির দিকে চাহিয়া রহিলেন। আপন মনে বলিলেন, 'তাহাকেই চাই।'

রঘুপতি কহিলেন, "তাহাকে আনিতেই হইবে— আজই আনিতে হইবে— আজ রাত্রেই চাই।"

নক্ষত্ররায় প্রতিধ্বনির মতো কহিলেন, "আজ রাত্রেই চাই !"

নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া গলার স্বর নামাইয়া রঘুপতি বলিলেন, "এই শিশুই তোমার শত্রু তাহা জান ? তুমি

রাজবংশে জন্মিয়াছ— কোথাকার এক অজ্ঞাতকুলশীল শিশু তোমার মাথা হইতে মুকুট কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে তাহা কি জান? যে সিংহাসন তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল সেই সিংহাসনে তাহার জন্য স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা কি দুটো চক্ষু থাকিতে দেখিতে পাইতেছ না?"

নক্ষত্ররায়ের কাছে এ-সকল কথা নূতন নহে। তিনিও পূর্বে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। সগর্বে বলিলেন, "তা কি আর বলিতে হইবে ঠাকুর! আমি কি আর এইটে দেখিতে পাই না!"

রঘুপতি কহিলেন, "তবে আর কী। তবে আমাকে আনিয়া দাও, তোমার সিংহাসনের বাধা দূর করি। এই ক'টা প্রহর কোনোমতে কাটিবে, তার পর— তুমি কখন আনিবে?"

নক্ষত্ররায়। আজ সন্ধ্যাবেলায়— অন্ধকার হইলে।

পইতা স্পর্শ করিয়া রঘুপতি বলিলেন, "যদি না আনিতে পার তো ব্রাহ্মণের অভিশাপ লাগিবে। তা হইলে যে মুখে তুমি প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিয়া পালন না কর ত্রিরাত্রি না পোহাইতে সেই মুখের মাংস শকুনিতে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইবে।"

শুনিয়া নক্ষত্ররায় চমকিয়া মুখে হাত বুলাইলেন— কোমল মাংসের উপরে শকুনির চঞ্চুপাত-কল্পনা তাঁহার নিতান্ত দুঃসহ বোধ হইল। রঘুপতিকে প্রণাম করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বিদায় লইলেন। সে ঘর হইতে আলোক বাতাস ও জনকোলাহলের মধ্যে গিয়া নক্ষত্ররায় পুনর্জীবন লাভ করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় নক্ষত্ররায়কে দেখিয়া ধ্রুব "কাকা" বলিয়া ছুটিয়া আসিল, দুটি ছোটো হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া তাঁহার কপোলে কপোল দিয়া মুখের কাছে মুখ রাখিল। চুপিচুপি বলিল, "কাকা!"

নক্ষত্র কহিলেন, "ছি, ও কথা বোলো না, আমি তোমার কাকা না।"

ধ্রুব তাঁহাকে এতকাল বরাবর কাকা বলিয়া আসিতেছিল, আজ সহসা বারণ শুনিয়া সে ভারী আশ্চর্য হইয়া গেল। গম্ভীরমুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তার পরে নক্ষত্রের মুখের দিকে বড়ো বড়ো চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আমি তোমার কাকা নই।"

শুনিয়া সহসা ধ্রুবের অত্যন্ত হাসি পাইল; এত বড়ো অসম্ভব কথা সে ইতিপূর্বে আর কখনো শুনে নাই, সে হাসিয়া বলিল, "তুমি কাকা।" নক্ষত্র যত নিষেধ করিতে লাগিলেন সে ততই বলিতে লাগিল, "তুমি কাকা।" তাহার হাসিও ততই বাড়িতে লাগিল। সে নক্ষত্ররায়কে কাকা বলিয়া খেপাইতে লাগিল। নক্ষত্র বলিলেন, "ধ্রুব, তোমার দিদিকে দেখিতে যাইবে?"

ধ্রুব তাড়াতাড়ি নক্ষত্রের গলা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল "দিদি কোথায়?"

নক্ষত্র বলিলেন, "মায়ের কাছে।"

ধ্রুব কহিল, "মা কোথায়?"

নক্ষত্র। মা আছেন এক জায়গায়। আমি সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।

ধ্রুব হাততালি দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কখন নিয়ে যাবে কাকা?"

নক্ষত্র। এখনি।

ধ্রুব আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিয়া সজোরে নক্ষত্রের গলা জড়াইয়া ধরিল; নক্ষত্র তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চাদরে আচ্ছাদন করিয়া গুপ্ত দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

আজ রাত্রেও পথে লোক বাহির হওয়া নিষেধ। এইজন্য পথে প্রহরী নাই। আকাশে পূর্ণচন্দ্র।

মন্দিরে গিয়া নক্ষত্ররায় ধ্রুবকে রঘুপতির হাতে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। রঘুপতিকে দেখিয়া ধ্রুব সবলে নক্ষত্ররায়কে জড়াইয়া ধরিল, কোনোমতে ছাড়িতে চাহিল না। রঘুপতি তাহাকে বলপূর্বক কাড়িয়া লইলেন। ধ্রুব "কাকা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল ; নক্ষত্ররায়ের চক্ষে জল আসিল, কিন্তু রঘুপতির কাছে এই হৃদয়ের দুর্বলতা দেখাইতে তাঁহার নিতান্ত লজ্জা করিতে লাগিল। তিনি ভাণ করিলেন, যেন তিনি পাষাণে গঠিত। তখন ধ্রুব কাঁদিয়া কাঁদিয়া "দিদি" "দিদি" বলিয়া ডাকিতে লাগিল, দিদি আসিল না। রঘুপতি বজ্রস্বরে এক ধমক দিয়া উঠিলেন। ভয়ে ধ্রুবের কান্না থামিয়া গেল। কেবল তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, কান্না ফাটিয়া ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। চতুর্দশ দেবমূর্তি চাহিয়া রহিল।

গোবিন্দমাণিক্য নিশীথে স্বপ্নে ক্রন্দন শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন। সহসা শুনিতে পাইলেন, তাঁহার বাতায়নের নীচে হইতে কে কাতর স্বরে ডাকিতেছে, "মহারাজ! মহারাজ!"

রাজা সত্বর উঠিয়া গিয়া চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলেন, ধ্রুবের পিতৃব্য কেদারেশ্বর। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে?"

কেদারেশ্বর কহিলেন, "মহারাজ, আমার ধ্রুব কোথায়?"

রাজা কহিলেন, "কেন, তাহার শয্যাতে নাই?"

"না।"—কেদারেশ্বর বলিতে লাগিলেন, "অপরাহ্ণ হইতে ধ্রুবকে না দেখিতে পাওয়ায় জিজ্ঞাসা করাতে যুবরাজ নক্ষত্ররায়ের ভৃত্য কহিল, 'ধ্রুব অন্তঃপুরে যুবরাজের কাছে আছে।' শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। অনেক রাত হইতে দেখিয়া আমার আশঙ্কা জন্মিল ; অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, যুবরাজ নক্ষত্ররায় প্রাসাদে নাই। আমি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ-প্রার্থনার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রহরীরা কিছুতেই আমার কথা গ্রাহ্য করিল না। এইজন্য বাতায়নের নীচে হইতে

মহারাজকে ডাকিয়াছি, আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি, আমার এই অপরাধ মার্জনা করিবেন।"

রাজার মনে একটা ভাব বিদ্যুতের মতো চমকিয়া উঠিল। তিনি চারিজন প্রহরীকে ডাকিলেন; কহিলেন, "সশস্ত্রে আমার অনুসরণ করো।"

একজন কহিল, "মহারাজ, আজ রাত্রে পথে বাহির হওয়া নিষেধ।"

রাজা কহিলেন, "আমি আদেশ করিতেছি।"

কেদারেশ্বর সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইলেন, রাজা তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে কহিলেন। বিজন পথে চন্দ্রালোকে রাজা মন্দিরাভিমুখে চলিলেন।

মন্দিরের দ্বার যখন সহসা খুলিয়া গেল, দেখা গেল, খড়্গ সম্মুখে করিয়া নক্ষত্র এবং রঘুপতি মদ্যপান করিতেছেন। আলোক অধিক নাই, একটি দীপ জ্বলিতেছে। ধ্রুব কোথায়? ধ্রুব কালীপ্রতিমার পায়ের কাছে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার কপোলের অশ্রুরেখা শুকাইয়া গেছে, ঠোঁট দুটি একটু খুলিয়া গেছে, মুখে ভয় নাই, ভাবনা নাই। এ যেন পাষাণশয্যা নয়, যেন সে দিদির কোলের উপরে শুইয়া আছে। দিদি যেন চুমো খাইয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়াছে।

মদ খাইয়া নক্ষত্রের প্রাণ খুলিয়া গিয়াছিল; কিন্তু রঘুপতি স্থির হইয়া বসিয়া পূজার লগ্নের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, নক্ষত্রের প্রলাপে কিছুমাত্র কান দিতেছিলেন না। নক্ষত্র বলিতেছিলেন, "ঠাকুর, তোমার মনে মনে ভয় হচ্ছে। তুমি মনে করছ আমিও ভয় করছি। কিন্তু ভয় নেই ঠাকুর! ভয় কিসের? ভয় কাকে? আমি তোমাকে রক্ষা করব। তুমি কি মনে কর আমি রাজাকে ভয় করি? আমি শাসুজাকে ভয় করি নে, আমি শাজাহানকে ভয় করি নে। ঠাকুর, তুমি বললে না কেন, আমি রাজাকে ধরে আনতুম, দেবীকে সন্তুষ্ট করে দেওয়া যেত। ওইটুকু ছেলের কতটুকুই বা রক্ত!"

এমন সময় সহসা মন্দিরের ভিত্তির উপরে ছায়া পড়িল। নক্ষত্ররায়

পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, রাজা। চকিতের মধ্যে নেশা সম্পূর্ণ ছুটিয়া গেল। নিজের ছায়ার চেয়ে নিজে মলিন হইয়া গেলেন। দ্রুতবেগে নিদ্রিত ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া গোবিন্দমাণিক্য প্রহরীদিগকে কহিলেন, "ইহাদের দুজনকে বন্দী করো।"

চারিজন প্রহরী রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের দুই হাত ধরিল। ধ্রুবকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বিজন পথে জ্যোৎস্নালোকে রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় সে রাত্রে কারাগারে রহিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিন বিচার। বিচারশালা লোকে লোকারণ্য। বিচারাসনে রাজা বসিয়াছেন, সভাসদেরা চারি দিকে বসিয়াছেন। সম্মুখে দুইজন বন্দী। কাহারও হাতে শৃঙ্খল নাই, কেবল সশস্ত্র প্রহরী তাঁহাদিগকে ঘেরিয়া আছে ; রঘুপতি পাষাণমূর্তির মতো দাঁড়াইয়া আছেন, নক্ষত্র-রায়ের মাথা নত।

রঘুপতির দোষ সপ্রমাণ করিয়া রাজা তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার কী বলিবার আছে ?"

রঘুপতি কহিলেন, "আমার বিচার করিবার অধিকার আপনার নাই।"

রাজা কহিলেন, "তবে তোমার বিচার কে করিবে ?"

রঘুপতি। আমি ব্রাহ্মণ, আমি দেবসেবক, দেবতা আমার বিচার করিবেন।

রাজা। পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার দিবার জন্য জগতে দেবতার সহস্র অনুচর আছে ; আমরাও তাহার একজন। সে কথা লইয়া আমি তোমার সহিত বিচার করিতে চাই না ; আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, কাল সন্ধ্যাকালে বলির মানসে তুমি একটি শিশুকে হরণ করিয়াছিলে কি না।

রঘুপতি কহিলেন, "হাঁ।"

রাজা কহিলেন, "তুমি অপরাধ স্বীকার করিতেছ ?"

রঘুপতি। অপরাধ ! অপরাধ কিসের ? আমি মায়ের আদেশ পালন করিতেছিলাম, মায়ের কার্য করিতেছিলাম, তুমি তাহার ব্যাঘাত করিয়াছ— অপরাধ তুমি করিয়াছ। আমি মায়ের সমক্ষে তোমাকে অপরাধী করিতেছি, তিনি তোমার বিচার করিবেন।

রাজা তাঁহার কথার কোনো উত্তর না দিয়া কহিলেন, "আমার রাজ্যের নিয়ম এই— যে ব্যক্তি দেবতার উদ্দেশে জীববলি দিবে বা দিতে উদ্যত হইবে তাহার নির্বাসনদণ্ড। সেই দণ্ড আমি তোমার প্রতি প্রয়োগ করিলাম। আটবৎসরের জন্য তুমি নির্বাসিত হইলে। প্রহরীরা তোমাকে আমার রাজ্যের বাহিরে রাখিয়া আসিবে।"

প্রহরীরা রঘুপতিকে সভাগৃহ হইতে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল। রঘুপতি তাহাদিগকে কহিলেন, "স্থির হও।" রাজার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোমার বিচার শেষ হইল— এখন আমি তোমার বিচার করিব, তুমি অবধান করো। চতুর্দশদেবতা-পূজার দুই রাত্রে যে-কেহ পথে বাহির হইবে পুরোহিতের কাছে সে দণ্ডিত হইবে, এই আমাদের মন্দিরের নিয়ম। সেই প্রাচীন নিয়ম-অনুসারে তুমি আমার নিকটে দণ্ডার্হ।"

রাজা কহিলেন, "আমি তোমার দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।"

সভাসদেরা কহিলেন, "এ অপরাধের কেবল অর্থদণ্ড হইতে পারে।"

পুরোহিত কহিলেন, "আমি তোমার দুইলক্ষ মুদ্রা দণ্ড করিতেছি। এখনি দিতে হইবে।"

রাজা কিয়ৎক্ষণ ভাবিলেন ; পরে বলিলেন, "তথাস্তু।" কোষাধ্যক্ষকে ডাকিয়া দুইলক্ষ মুদ্রা আদেশ করিয়া দিলেন। প্রহরীরা রঘুপতিকে বাহিরে লইয়া গেল।

রঘুপতি চলিয়া গেলে নক্ষত্ররায়ের দিকে চাহিয়া রাজা দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "নক্ষত্ররায়, তোমার অপরাধ তুমি স্বীকার কর কি না ?"

নক্ষত্ররায় বলিলেন, "মহারাজ, আমি অপরাধী, আমাকে মার্জনা করুন।" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া রাজার পা জড়াইয়া ধরিলেন।

মহারাজ বিচলিত হইলেন; কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্তি হইল না। অবশেষে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "নক্ষত্ররায়, ওঠো, আমার কথা শোনো। আমি মার্জনা করিবার কে ? আমি আপনার শাসনে আপনি বদ্ধ। বন্দীও যেমন বদ্ধ বিচারকও তেমনি বদ্ধ। একই অপরাধে আমি একজনকে দণ্ড দিব, একজনকে মার্জনা করিব, এ কী করিয়া হয় ? তুমিই বিচার করো।"

সভাসদেরা বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, নক্ষত্ররায় আপনার ভাই, আপনার ভাইকে মার্জনা করুন।"

রাজা দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "তোমরা সকলে চুপ করো। যতক্ষণ আমি এই আসনে আছি ততক্ষণ আমি কাহারও ভাই নহি, কাহারও বন্ধু নহি।"

সভাসদেরা চারি দিকে চুপ করিলেন। সভা নিস্তব্ধ হইল। রাজা গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, "তোমরা সকলেই শুনিয়াছ— আমার রাজ্যে নিয়ম এই যে, যে ব্যক্তি দেবতার উদ্দেশে জীববলি দিবে বা দিতে উদ্যত হইবে তাহার নির্বাসনদণ্ড। কাল সন্ধ্যাকালে নক্ষত্ররায় পুরোহিতের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া বলির মানসে একটি শিশুকে হরণ করিয়াছিলেন। এই অপরাধ সপ্রমাণ হওয়াতে আমি তাঁহার আট বৎসর নির্বাসনদণ্ড বিধান করিলাম।"

প্রহরীরা যখন নক্ষত্ররায়কে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল তখন রাজা আসন হইতে নামিয়া নক্ষত্ররায়কে আলিঙ্গন করিলেন; রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "বৎস, কেবল তোমার দণ্ড হইল না, আমারও দণ্ড হইল। না জানি পূর্বজন্মে কী অপরাধ করিয়াছিলাম। যত দিন তুমি বন্ধুদের

কাছ হইতে দূরে থাকিবে দেবতা তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন, তোমার মঙ্গল করুন।”

সংবাদ দেখিতে দেখিতে রাষ্ট্র হইল। অন্তঃপুরে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। রাজা নিভৃত কক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। জোড়হাতে কহিতে লাগিলেন, “প্রভু, আমি যদি কখনো অপরাধ করি আমাকে মার্জনা করিয়ো না, আমাকে কিছুমাত্র দয়া করিয়ো না। আমাকে আমার পাপের শাস্তি দাও। পাপ করিয়া শাস্তি বহন করা যায়, কিন্তু মার্জনাভার বহন করা যায় না প্রভু!”

নক্ষত্ররায়ের প্রেম রাজার মনে দ্বিগুণ জাগিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ের ছেলেবেলাকার মুখ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। সে যে-সকল খেলা করিয়াছে, কথা কহিয়াছে, কাজ করিয়াছে, তাহা একে একে তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল। এক-একটা দিন এক-একটা রাত্রি তাহার সূর্যালোকের মধ্যে, তাহার তারাখচিত আকাশের মধ্যে শিশু নক্ষত্ররায়কে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উদয় হইল। রাজার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

নির্বাসনোদ্যত রঘুপতিকে যখন প্রহরীরা জিজ্ঞাসা করিল “ঠাকুর, কোন্ দিকে যাইবেন” তখন রঘুপতি উত্তর করিলেন, “পশ্চিম দিকে যাইব।”

নয় দিন পশ্চিমমুখে যাত্রার পর বন্দী ও প্রহরীরা ঢাকা শহরের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিল। তখন প্রহরীরা রঘুপতিকে ছাড়িয়া দিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিল।

রঘুপতি মনে মনে বলিলেন, ‘কলিতে ব্রহ্মশাপ ফলে না। দেখা যাক ব্রাহ্মণের বুদ্ধিতে কতটা হয়। দেখা যাক, গোবিন্দমাণিক্যই বা কেমন রাজা, আর আমিই বা কেমন পুরোহিত-ঠাকুর।’

ত্রিপুরার প্রান্তে মন্দিরের কোণে মোগল-রাজ্যের সংবাদ বড়ো পৌঁছিত না। এই নিমিত্ত রঘুপতি ঢাকা শহরে গিয়া মোগলদিগের রীতিনীতি ও রাজ্যের অবস্থা জানিতে কৌতূহলী হইলেন।

তখন মোগল-সম্রাট শাজাহানের রাজত্বকাল। তখন তাঁহার তৃতীয় পুত্র ঔরংজীব দক্ষিণাপথে বিজাপুর আক্রমণে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুজা বাংলার অধিপতি ছিলেন; রাজমহলে তাঁহার রাজধানী। কনিষ্ঠ পুত্র কুমার মুরাদ গুজরাটের শাসনকর্তা। জ্যেষ্ঠ যুবরাজ দারা রাজধানী দিল্লীতেই বাস করিতেছেন। সম্রাটের বয়স ৬৭ বৎসর। তাঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া দারার উপরেই সাম্রাজ্যের ভার পড়িয়াছে।

রঘুপতি কিয়ৎকাল ঢাকায় বাস করিয়া উর্দুভাষা শিক্ষা করিলেন ও অবশেষে রাজমহল-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজমহলে যখন পৌঁছিলেন তখন ভারতবর্ষে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। সংবাদ রাষ্ট্র হইয়াছে যে, শাজাহান মৃত্যুশয্যায় শয়ান। এই সংবাদ পাইয়া মাত্র সুজা সৈন্য-সহিত দিল্লী-অভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন। সম্রাটের চারি পুত্রই মুমূর্ষু শাজাহানের মাথার উপর হইতে মুকুটটা একেবারে ছোঁ মারিয়া উড়াইয়া লইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ অরাজক রাজমহল ত্যাগ করিয়া সুজার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। লোকজন বাহক প্রভৃতিকে বিদায় করিয়া দিলেন। সঙ্গে যে দুই লক্ষ টাকা ছিল তাহা রাজমহলের নিকটবর্তী এক বিজন প্রান্তরে পুঁতিয়া ফেলিলেন। তাহার উপরে এক চিহ্ন রাখিয়া গেলেন। অতি অল্প টাকাই সঙ্গে লইলেন। দগ্ধ কুটির, পরিত্যক্ত গ্রাম, মর্দিত শস্যক্ষেত্র লক্ষ্য করিয়া রঘুপতি অবিশ্রাম অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রঘুপতি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর বেশ সত্ত্বেও আতিথ্য পাওয়া দুর্ঘট। কারণ পঙ্গপালের ন্যায় সৈন্যরা যে পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহার উভয় পার্শ্বে কেবল দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিতেছে।

সৈন্যেরা অশ্ব ও হস্তী -পালের জন্য অপক্ক শস্য কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। কৃষকের মরাইয়ে একটি কণা অবশিষ্ট নাই। চারি দিকে কেবল লুণ্ঠনাবশিষ্ট বিশৃঙ্খলা। অধিকাংশ লোক গ্রাম ছাড়িয়া পালাইয়াছে। দৈবাৎ যে দু-একজনকে দেখা যায় তাহাদের মুখে হাস্য নাই। তাহারা চকিত হরিণের ন্যায় সতর্ক, কাহাকেও তাহারা বিশ্বাস করেনা, দয়া করে না। নির্জন পথের পার্শ্বে গাছের তলায় লাঠি হাতে দুই-চারিজনকে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়; পথিক-শিকারের জন্য তাহারা সমস্তদিন অপেক্ষা করিয়া আছে। ধূমকেতুর পশ্চাদ্‌বর্তী উল্কারাশির ন্যায় দস্যুরা সৈনিকদের অনুসরণ করিয়া লুণ্ঠনাবশেষ লুঠিয়া লইয়া যায়। এমন-কি, মৃতদেহের উপর শৃগাল-কুকুরের ন্যায় মাঝে মাঝে সৈন্যদলে ও দস্যুদলে লড়াই বাধিয়া যায়। নিষ্ঠুরতা সৈন্যদের খেলা হইয়াছে— পার্শ্ববর্তী নিরীহ পথিকের পেটে খপ্‌ করিয়া একটা তলোয়ারের খোঁচা বসাইয়া দেওয়া বা তাহার মুণ্ড হইতে পাগড়ি-সমেত খানিকটা খুলি উড়াইয়া দেওয়া তাহারা সামান্য উপহাস মাত্র মনে করে। গ্রামের লোকেরা তাহাদের দেখিয়া ভয় পাইতেছে দেখিলে তাহাদের পরম কৌতুক বোধ হয়। লুণ্ঠনাবশেষে তাহারা গ্রামের লোকদের উৎপীড়ন করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। দুইজন মান্য ব্রাহ্মণকে পিঠে পিঠে সংলগ্ন করিয়া টিকিতে টিকিতে বাঁধিয়া উভয়ের নাকে নস্য প্রয়োগ করে। দুই ঘোড়ার পিঠে একজন মানুষকে চড়াইয়া ঘোড়াদুটোকে চাবুক মারে, দুই ঘোড়া দুই বিপরীত দিকে ছুটিয়া যায়—মাঝখানে মানুষটা পড়িয়া গিয়া হাত-পা ভাঙে— এইরূপ প্রতিদিন নূতন নূতন খেলা তাহারা আবিষ্কার করে। অকারণে গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া যায়। বলে যে, বাদশাহের সম্মানার্থ বাজি পুড়াইতেছে। সৈন্যদের পথে এইরূপ অত্যাচারের শত শত চিহ্ন পড়িয়া আছে। এখানে রঘুপতি আতিথ্য পাইবেন কোথায়! কোনোদিন অনাহারে কোনোদিন স্বল্পাহারে কাটিতে লাগিল। রাত্রে অন্ধকারে এক ভগ্ন পরিত্যক্ত

কুটিরে শ্রান্তদেহে শয়ন করিয়াছিলেন ; সকালে উঠিয়া দেখেন, এক ছিন্নশির মৃতদেহকে সমস্ত রাত্রি বালিশ করিয়া শুইয়াছিলেন। একদিন মধ্যাহ্নে রঘুপতি ক্ষুধিত হইয়া কোনো কুটিরে গিয়া দেখিলেন, একজন লোক তাহার ভাঙা সিন্দুকের উপরে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে, বোধ হয় তাহার লুণ্ঠিত ধনের জন্য শোক করিতেছিল। কাছে গিয়া ঠেলিতেই সে গড়াইয়া পড়িয়া গেল। মৃতদেহ মাত্র—তাহার জীবন অনেক কাল হইল চলিয়া গিয়াছে।

একদিন রঘুপতি এক কুটিরে শুইয়া আছেন। রাত্রি অবসান হয় নাই, কিছু বিলম্ব আছে। এমন সময় ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া গেল। শরতের চন্দ্রালোকের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ছায়া ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল, ফিস্ ফিস্ করিয়া শব্দ শুনা গেল। রঘুপতি চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। তিনি উঠিতেই কতকগুলি স্ত্রীকণ্ঠ সভয়ে বলিয়া উঠিল, "ও মাগো!"

একজন পুরুষ অগ্রসর হইয়া বলিল, "কোন্ হ্যায় রে ?"

রঘুপতি কহিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, পথিক। তোমরা কে ?"

"আমাদের এই ঘর। আমরা ঘর ছাড়িয়া পালাইয়াছিলাম। মোগল-সৈন্য চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া তবে এখানে আসিয়াছি।"

রঘুপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোগল সৈন্য কোন্ দিকে গিয়াছে ?"

তাহারা কহিল, "বিজয়গড়ের দিকে। এতক্ষণ বিজয়গড়ের বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।"

রঘুপতি আর অধিক কিছু না বলিয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বিজয়গড়ের দীর্ঘ বন ঠগীদের আড্ডা। বনের মধ্য দিয়া যে পথ গিয়াছে সেই পথের দুই পার্শ্বে কত মনুষ্যকঙ্কাল নিহিত আছে, তাহাদের

উপরে কেবল বনফুল ফুটিতেছে, আর কোনো চিহ্ন নাই। বনের মধ্যে বট আছে, বাবলা আছে, নিম আছে, শত শত প্রকারের লতা ও গুল্ম আছে। স্থানে স্থানে ডোবা অথবা পুকুরের মতো দেখা যায়; অবিশ্রাম পাতা পচিয়া পচিয়া তাহার জল একেবারে সবুজ হইয়া উঠিয়াছে। ছোটো ছোটো সুঁড়িপথ এ দিকে ওদিকে আঁকিয়াবাঁকিয়া সাপের মতো অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। গাছের ডালে ডালে পালে পালে হনুমান। বটগাছের ডালের উপর হইতে শত শত শিকড় এবং হনুমানের লেজ ঝুলিতেছে। ভাঙা মন্দিরের প্রাঙ্গণে শিউলি ফুলের গাছ সাদা সাদা ফুলে এবং হনুমানের দন্তবিকাশে একেবারে আচ্ছন্ন। সন্ধ্যাবেলায় বড়ো বড়ো ঝাঁকড়া গাছের উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখির চীৎকারে বনের ঘোর অন্ধকার যেন দীর্ণবিদীর্ণ হইতে থাকে। আজ এই বৃহৎ বনের মধ্যে প্রায় কুড়ি হাজার সৈন্য প্রবেশ করিয়াছে। এই ডালে-পালায় লতায়-লতায় তৃণে-গুল্মে জড়িত বৃহৎ গোলাকার অরণ্য কুড়ি হাজার খরনখচঞ্চু সৈনিক-বাজপক্ষীদের একটিমাত্র নীড় বলিয়া বোধ হইতেছে। সৈন্যসমাগম দেখিয়া অসংখ্য কাক কা-কা করিয়া দল বাঁধিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে; সাহস করিয়া ডালের উপর আসিয়া বসিতেছে না। কোনোপ্রকার গোলমাল করিতে সেনাপতির নিষেধ আছে। সৈন্যেরা সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যাবেলায় বনে আসিয়া শুষ্ক কাঠ কুড়াইয়া রন্ধন করিতেছে ও পরস্পর চুপিচুপি কথা কহিতেছে; তাহাদের সেই গুন্ গুন্ শব্দে সমস্ত অরণ্য গম্‌গম্ করিতেছে, সন্ধ্যাবেলায় ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাইতেছে না। গাছের গুঁড়িতে বাঁধা অশ্বেরা মাঝে মাঝে ক্ষুর দিয়া মাটি খুঁড়িতেছে ও হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিতেছে; সমস্ত বনের তাহাতে চমক লাগিতেছে। ভাঙা মন্দিরের কাছে ফাঁকা জায়গায় শাসুজার শিবির পড়িয়াছে। আর-সকলের আজ বৃক্ষতলেই অবস্থান।

সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত চলিয়া রঘুপতি বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন রাত্রি হইয়াছে। অধিকাংশ সৈন্য নিস্তব্ধে ঘুমাইতেছে, অল্পমাত্র সৈন্য নীরবে পাহারা দিতেছে। মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় আগুন জ্বলিতেছে; অন্ধকার যেন বহু কষ্টে নিদ্রাক্রান্ত রাঙা চক্ষু মেলিয়াছে। রঘুপতি বনের মধ্যে পা দিয়াই কুড়ি হাজার সৈনিকের নিশ্বাস-প্রশ্বাস যেন শুনিতে পাইলেন। বনের সহস্র গাছ পাখা বিস্তার করিয়া পাহারা দিতেছে। কালপেচক তাহার সদ্যোজাত শাবকের উপর যেমন পক্ষ বিস্তারিত করিয়া বসিয়া থাকে তেমনি অরণ্যের বাহিরকার বিরাট রাত্রি অরণ্যের ভিতরকার গাঢ়তর রাত্রির উপর চাপিয়া ডানা ঝাঁপিয়া নীরবে বসিয়া আছে; অরণ্যের ভিতরে এক রাত্রি মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইয় আছে, অরণ্যের বাহিরে এক রাত্রি মাথা তুলিয়া জাগিয়া আছে রঘুপতি সে রাত্রে বনপ্রান্তে শুইয়া রহিলেন।

সকালে গোটা দুই-চার খোঁচা খাইয়া ধড়্‌ফড়্ করিয়া জাগিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, জন-কত পাগড়ি-বাঁধা দাড়ি-পরিপূর্ণ তুরানি সৈন্য বিদেশী ভাষায় তাঁহাকে কী বলিতেছে; শুনিয়া তিনি নিশ্চয় অনুমান করিয়া লইলেন, গালি। তিনিও বঙ্গভাষায় তাহাদের শ্যালক-সম্বন্ধ প্রচার করিয়া দিলেন। তাহারা তাঁহাকে টানাটানি করিতে লাগিল।

রঘুপতি বলিলেন, "ঠাট্টা পেয়েছিস?" কিন্তু তাহাদের আচরণে ঠাট্টার লক্ষণ কিছুমাত্র প্রকাশ পাইল না। বনের মধ্য দিয়া তাহারা তাঁহাকে অকাতরে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

তিনি সবিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "টানাটানি কর কেন? আমি আপনিই যাচ্ছি। এত পথ আমি এলুম কী করতে?"

সৈন্যরা হাসিতে লাগিল ও তাঁহার বাংলা কথা নকল করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার চতুর্দিকে বিস্তর সৈন্য জড়ো হইল, তাঁহাকে লইয়া ভারি গোল পড়িয়া গেল। উৎপীড়নেরও সীমা রহিল না।

একজন সৈন্য একটা কাঠবিড়ালের লেজ ধরিয়া তাঁহার মুণ্ডিত মাথায় ছাড়িয়া দিল; দেখিবার ইচ্ছা, ফল মনে করিয়া খায় কি না। একজন সৈন্য তাঁহার নাকের সম্মুখে একটা মোটা বেত বাঁকাইয়া ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল, সেটা ছাড়িয়া দিলে রঘুপতির মুখের উপর হইতে নাকের সমুন্নত মহিমা একেবারে সমূলে লোপ হইবার সম্ভাবনা। সৈন্যদের হাস্যে কানন ধ্বনিত হইতে লাগিল। মধ্যাহ্নে আজ যুদ্ধ করিতে হইবে, সকালে তাই রঘুপতিকে লইয়া তাহাদের ভারি খেলা পড়িয়া গেল। খেলার সাধ মিটিলে পর ব্রাহ্মণকে সুজার শিবিরে লইয়া গেল।

সুজাকে দেখিয়া রঘুপতি সেলাম করিলেন না। তিনি দেবতা ও স্বর্ণ ছাড়া আর-কাহারও কাছে কখনও মাথা নত করেন নাই। মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; হাত তুলিয়া বলিলেন, "শাহেন-শার জয় হউক।"

সুজা মদের পেয়ালা লইয়া সভাসদ্-সমেত বসিয়া ছিলেন; আলস্য-বিজড়িত স্বরে নিতান্ত উপেক্ষাভরে কহিলেন, "কী, ব্যাপার কী?"

সৈন্যেরা কহিল, "জনাব, শত্রুপক্ষের চর গোপনে আমাদের বলাবল জানিতে আসিয়াছিল; আমরা তাকে প্রভুর কাছে ধরিয়া আনিয়াছি।"

সুজা কহিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা। বেচারা দেখিতে আসিয়াছে, উহাকে ভালো করিয়া সমস্ত দেখাইয়া ছাড়িয়া দাও। দেশে গিয়া গল্প করিবে।"

রঘুপতি বদ হিন্দুস্থানিতে কহিলেন, "সরকারের অধীনে আমি কর্ম প্রার্থনা করি।"

সুজা আলস্যভরে হাত নাড়িয়া তাঁহাকে দ্রুত চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। বলিলেন, "গরম।" যে বাতাস করিতেছিল সে দ্বিগুণ জোরে বাতাস করিতে লাগিল।

দারা তাঁহার পুত্র সুলেমানকে রাজা জয়সিংহের অধীনে সুজার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের বৃহৎ সৈন্যদল

নিকটবর্তী হইয়াছে, সংবাদ আসিয়াছে। তাই বিজয়গড়ের কেল্লা অধিকার করিয়া সেইখানে সৈন্য সমবেত করিবার জন্য সুজা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সুজার হাতে কেল্লা এবং সরকারি খাজনা সমর্পণ করিবার প্রস্তাব লইয়া বিজয়গড়ের অধিপতি বিক্রমসিংহের নিকট দূত গিয়াছিল। বিক্রমসিংহ সেই দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি কেবল দিল্লীশ্বর শাজাহান এবং জগদীশ্বর ভবানীপতিকে জানি। সুজা কে? আমি তাহাকে জানি না।"

সুজা জড়িত স্বরে কহিলেন, "ভারি বেআদব! নাহক আবার লড়াই করিতে হইবে। ভারি হাঙ্গাম।"

রঘুপতি এই-সমস্ত শুনিতে পাইলেন। সৈন্যদের হাত এড়াইবা মাত্র বিজয়গড়ের দিকে চলিয়া গেলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

পাহাড়ের উপরে বিজয়গড়। বিজয়গড়ের অরণ্য গড়ের কাছাকাছি গিয়া শেষ হইয়াছে। অরণ্য হইতে বাহির হইয়া রঘুপতি সহসা দেখিলেন, দীর্ঘ পাষাণদুর্গ যেন নীল আকাশে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অরণ্য যেমন তাহার সহস্র তরুজালে প্রচ্ছন্ন, দুর্গ তেমনি তাহার পাষাণের মধ্যে আপনি রুদ্ধ। অরণ্য সাবধানী, দুর্গ সতর্ক। অরণ্য ব্যাঘ্রের মতো গুঁড়ি মারিয়া লেজ পাকাইয়া বসিয়া আছে, দুর্গ সিংহের মতো কেশর ফুলাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অরণ্য মাটিতে কান পাতিয়া শুনিতেছে, দুর্গ আকাশে মাথা তুলিয়া দেখিতেছে।

রঘুপতি অরণ্য হইতে বাহির হইবা মাত্র দুর্গ প্রাকারের উপরে সৈন্যরা সচকিত হইয়া উঠিল। শৃঙ্গ বাজিয়া উঠিল। দুর্গ যেন সহসা সিংহনাদ করিয়া দাঁত নখ মেলিয়া ভ্রূকুটি করিয়া দাঁড়াইল। রঘুপতি পইতা দেখাইয়া, হাত তুলিয়া ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যরা সতর্ক

হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রঘুপতি যখন দুর্গপ্রাচীরের কাছাকাছি গেলেন তখন সৈন্যেরা জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "তুমি কে?"

রঘুপতি বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ অতিথি।"

দুর্গাধিপতি বিক্রমসিংহ পরম ধর্মনিষ্ঠ। দেবতা ব্রাহ্মণ ও অতিথি সেবায় নিযুক্ত। পইতা থাকিলে দুর্গপ্রবেশের জন্য আর-কোনো পরিচয়ের আবশ্যক ছিল না। কিন্তু আজ যুদ্ধের দিনে কী করা উচিত সৈন্যেরা ভাবিয়া পাইতেছিল না।

রঘুপতি কহিলেন, "তোমরা আশ্রয় না দিলে মুসলমানের হাতে আমাকে মরিতে হইবে।"

বিক্রমসিংহের কানে যখন এ কথা গেল, তখন তিনি ব্রাহ্মণকে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় দিতে অনুমতি করিলেন। প্রাচীরের উপর হইতে একটা মই নামানো হইল, রঘুপতি দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দুর্গের মধ্যে যুদ্ধের প্রতীক্ষায় সকলেই নিতান্ত ব্যস্ত। বৃদ্ধ খুড়াসাহেব ব্রাহ্মণ-অভ্যর্থনার ভার স্বয়ং লইলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম খড়্গসিংহ, কিন্তু তাঁহাকে কেহ বলে খুড়াসাহেব, কেহ বলে সুবাদার-সাহেব— কেন যে বলে তাহার কোনো কারণ পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নাই, ভাই নাই, তাঁহার খুড়া হইবার কোনো অধিকার বা সুদূর সম্ভাবনা নাই এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যতগুলি তাঁহার সুবা তাঁহার অপেক্ষা অধিক নহে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেহ তাঁহার উপাধি সম্বন্ধে কোনোপ্রকার আপত্তি অথবা সন্দেহ উত্থাপিত করে নাই। যাহারা বিনা ভাইপোয় খুড়া, বিনা সুবায় সুবাদার, সংসারের অনিত্যতা ও লক্ষ্মীর চপলতা-নিবন্ধন তাহাদের পদচ্যুতির কোনো আশঙ্কা নাই।

খুড়াসাহেব আসিয়া কহিলেন, "বাহবা, এই তো ব্রাহ্মণ বটে।" বলিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। রঘুপতির একপ্রকার তেজীয়ান দীপশিখার মতো আকৃতি ছিল যাহা দেখিয়া সহসা পতঙ্গেরা মুগ্ধ হইয়া যাইত।

খুড়াসাহেব জগতের বর্তমান শোচনীয় অবস্থায় বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন, "ঠাকুর, তেমন ব্রাহ্মণ আজকাল ক'টা মেলে ?"

রঘুপতি কহিলেন, "অতি অল্প।"

খুড়াসাহেব কহিলেন, "আগে ব্রাহ্মণের মুখে অগ্নি ছিল, এখন সমস্ত অগ্নি জঠরে আশ্রয় লইয়াছে।"

রঘুপতি কহিলেন, "তাও কি আগেকার মতো আছে।"

খুড়াসাহেব, মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "ঠিক কথা। অগস্ত্য মুনি যে-আন্দাজ পান করিয়াছিলেন সে আন্দাজ যদি আহার করিতেন তাহা হইলে একবার বুঝিয়া দেখুন।"

রঘুপতি কহিলেন, "আরও দৃষ্টান্ত আছে।"

খুড়াসাহেব। হাঁ, আছে বৈকি। জহ্নুমুনির পিপাসার কথা শুনা যায়। তাঁহার ক্ষুধার কথা কোথাও লেখা নাই, কিন্তু একটা অনুমান করা যাইতে পারে। হরীতকি খাইলেই যে কম খাওয়া হয় তাহা নহে, ক'টা করিয়া হরীতকি তাঁহারা রোজ খাইতেন তাহার একটা হিসাব থাকিলে তবু বুঝিতে পারিতাম।

রঘুপতি ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, "না সাহেব, আহারের প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট মনোযোগ ছিল না।"

খুড়াসাহেব জিভ কাটিয়া বলিলেন, "রাম রাম, বলেন কী ঠাকুর! তাঁহাদের জঠরানল যে অত্যন্ত প্রবল ছিল তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। দেখুন-না কেন, কালক্রমে আর-সকল অগ্নিই নিবিয়া গেল, হোমের অগ্নিও জ্বলে না, কিন্তু—"

রঘুপতি কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "হোমের অগ্নি আর জ্বলিবে কী করিয়া? দেশে ঘি রহিল কই? পাষণ্ডেরা সমস্ত গোরু পার করিয়া দিতেছে, এখন হব্য পাওয়া যায় কোথায়? হোমাগ্নি না জ্বলিলে ব্রহ্মতেজ আর কতদিন টেকে!" বলিয়া রঘুপতি নিজের প্রচ্ছন্ন দাহিকাশক্তি

অত্যন্ত অনুভব করিতে লাগিলেন।

খুড়াসাহেব কহিলেন, "ঠিক বলিয়াছেন ঠাকুর, গোরুগুলো মরিয়া আজকাল মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কাছ হইতে ঘি পাইবার প্রত্যাশা করা যায় না। মগজের সম্পূর্ণ অভাব। ঠাকুরের কোথা হইতে আসা হইতেছে?"

রঘুপতি কহিলেন, "ত্রিপুরার রাজবাটী হইতে।"

বিজয়গড়ের বহিঃস্থিত ভারতবর্ষের ভূগোল অথবা ইতিহাস সম্বন্ধে খুড়াসাহেবের অতি সামান্য জানা ছিল। বিজয়গড় ছাড়া ভারতবর্ষে জানিবার যোগ্য যে আর-কিছু আছে, তাহাও তাঁহার বিশ্বাস নহে। সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিলেন, "আহা, ত্রিপুরার রাজা মস্ত রাজা।"

রঘুপতি তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন।

খুড়াসাহেব। ঠাকুরের কী করা হয়?

রঘুপতি। আমি ত্রিপুরার রাজপুরোহিত।

খুড়াসাহেব চোখ বুজিয়া মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "আহা।" রঘুপতির উপরে তাঁহার ভক্তি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

"কি করিতে আসা হইয়াছে?"

রঘুপতি কহিলেন, "তীর্থ দর্শন করিতে।"

ধুম্ করিয়া আওয়াজ হইল। শত্রুপক্ষ দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে। খুড়াসাহেব হাসিয়া চোখ টিপিয়া কহিলেন, "ও কিছু নয়, ঢেলা ছুড়িতেছে।" বিজয়গড়ের উপরে খুড়াসাহেবের বিশ্বাস যত দৃঢ় বিজয়গড়ের পাষাণ তত দৃঢ় নহে। বিদেশী পথিক দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেই খুড়াসাহেব তাহাকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসেন এবং বিজয়গড়ের মাহাত্ম্য তাহার মনে বদ্ধমূল করিয়া দেন। ত্রিপুরার রাজবাটী হইতে রঘুপতি আসিয়াছেন, এমন অতিথি সচরাচর মেলে না— খুড়াসাহেব

অত্যন্ত উল্লাসে আছেন। অতিথির সঙ্গে বিজয়গড়ের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, ব্রহ্মার অণ্ড এবং বিজয়গড়ের দুর্গ যে প্রায় একই সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ঠিক মনুর পর হইতে মহারাজ বিক্রমসিংহের পূর্বপুরুষেরা যে এই দুর্গ ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন সে বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। এই দুর্গের প্রতি শিবের কী বর আছে এবং এই দুর্গে কার্তবীর্যার্জুন যে কিরূপে বন্দী হইয়াছিলেন তাহাও রঘুপতির অগোচর রহিল না।

সন্ধ্যার সময় সংবাদ পাওয়া গেল, শত্রুপক্ষ দুর্গের কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই। তাহারা কামান পাতিয়াছিল, কিন্তু কামানের গোলা দুর্গে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। খুড়াসাহেব হাসিয়া রঘুপতির দিকে চাহিলেন। মর্ম এই যে, দুর্গের প্রতি শিবের যে অমোঘ বর আছে তাহার এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কী হইতে পারে! বোধ করি নন্দী স্বয়ং আসিয়া কামানের গোলাগুলি লুফিয়া লইয়া গিয়াছে, কৈলাসে গণপতি ও কার্তিকেয় ভাঁটা খেলিবেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

শাসুজাকে কোনোমতে হস্তগত করাই রঘুপতির উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যখন শুনিলেন, সুজা দুর্গ আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন মনে করিলেন, মিত্রভাবে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি কোনোরূপে সুজার দুর্গ-আক্রমণে সাহায্য করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ যুদ্ধবিগ্রহের কোনো ধার ধারেন না, কী করিলে যে সুজার সাহায্য হইতে পারে ভাবিয়া পাইলেন না।

পরদিন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিপক্ষ পক্ষ বারুদ দিয়া দুর্গ-প্রাচীরের কিয়দংশ উড়াইয়া দিল, কিন্তু ঘন ঘন গুলিবর্ষণের প্রভাবে দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিল না। ভগ্ন অংশ দেখিতে দেখিতে গাঁথিয়া

তোলা হইল। আজ মাঝে মাঝে দুর্গের মধ্যে গোলাগুলি আসিয়া পড়িতে লাগিল, দুই-চারিজন করিয়া দুর্গ-সৈন্য হত ও আহত হইতে লাগিল।

"ঠাকুর, কিছু ভয় নাই, এ কেবল খেলা হইতেছে" বলিয়া খুড়াসাহেব রঘুপতিকে লইয়া দুর্গের চারি দিক দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কোথায় অস্ত্রাগার, কোথায় ভাণ্ডার, কোথায় আহতদের চিকিৎসাগৃহ, কোথায় বন্দীশালা, কোথায় দরবার, এই-সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইতে লাগিলেন ও বার বার রঘুপতির মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। রঘুপতি কহিলেন, "চমৎকার কারখানা! ত্রিপুরার গড় ইহার কাছে লাগিতে পারে না। কিন্তু সাহেব, গোপনে পলায়নের জন্য ত্রিপুরার গড়ে একটি আশ্চর্য সুরঙ্গ-পথ আছে, এখানে সেরূপ কিছুই দেখিতেছি না।"

খুড়াসাহেব কী একটা বলিতে যাইতেছিলেন, সহসা আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন, "না, এ দুর্গে সেরূপ কিছুই নাই।"

রঘুপতি নিতান্ত আশ্চর্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "এত বড়ো দুর্গে একটা সুরঙ্গ-পথ নাই, এ কেমন কথা হইল!"

খুড়াসাহেব কিছু কাতর হইয়া কহিলেন, "নাই, এ কি হইতে পারে? অবশ্যই আছে, তবে আমরা কেহ জানি না।"

রঘুপতি হাসিয়া কহিলেন, "তবে তো না থাকারই মধ্যে। যখন আপনিই জানেন না তখন আর কেই বা জানে?"

খুড়াসাহেব অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তার পরে সহসা "রাম রাম" বলিয়া তুড়ি দিয়া হাই তুলিলেন, তার পর মুখে গোঁফে দাড়িতে দুই-একবার হাত বুলাইয়া হঠাৎ বলিলেন, "ঠাকুর, পূজা-অর্চনা লইয়া থাকেন, আপনাকে বলিতে কোনো দোষ নাই— দুর্গ-প্রবেশের এবং দুর্গ হইতে বাহির হইবার দুইটা গোপন পথ আছে। কিন্তু বাহিরের কোনো লোককে তাহা দেখানো নিষেধ।"

রঘুপতি কিঞ্চিৎ সন্দেহের স্বরে কহিলেন, "বটে ! তা হবে।"

খুড়াসাহেব দেখিলেন তাঁহারই দোষ, একবার 'নাই' একবার 'আছে' বলিলে লোকের স্বভাবতঃই সন্দেহ হইতে পারে। বিদেশীর চোখে ত্রিপুরার গড়ের কাছে বিজয়গড় কোনো অংশে খাটো হইয়া যাইবে ইহা খুড়াসাহেবের পক্ষে অসহ্য।

তিনি কহিলেন, "ঠাকুর, বোধ করি আপনার ত্রিপুরা অনেক দূরে এবং আপনি ব্রাহ্মণ, দেবসেবাই আপনার একমাত্র কাজ, আপনার দ্বারা কিছু প্রকাশ হইবার সম্ভবনা নাই।"

রঘুপতি কহিলেন, "কাজ কী সাহেব, সন্দেহ হয় তো ও-সব কথা থাক্-না। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার দুর্গের খবরে কাজ কী ?"

খুড়াসাহেব জিভ কাটিয়া কহিলেন, "আরে রাম রাম, আপনাকে আবার সন্দেহ কিসের ? চলুন, একবার দেখাইয়া লইয়া আসি।"

এ দিকে সহসা দুর্গের বাহিরে সুজার সেনাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে। অরণ্যের মধ্যে সুজার শিবির ছিল ; সুলেমান এবং জয়সিংহের সৈন্য আসিয়া সহসা তাঁহাকে বন্দী করিয়াছে এবং অলক্ষ্যে দুর্গ-আক্রমণকারীদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সুজার সৈন্যেরা লড়াই না করিয়া কুড়িটা কামান পশ্চাতে ফেলিয়া ভঙ্গ দিল।

দুর্গের মধ্যে ধুম পড়িয়া গেল। বিক্রমসিংহের নিকট সুলেমানের দূত পৌঁছিতেই তিনি দুর্গের দ্বার খুলিয়া দিলেন, স্বয়ং অগ্রসর হইয়া সুলেমান ও রাজা জয়সিংহকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। দিল্লীশ্বরের সৈন্য ও অশ্ব-গজে দুর্গ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। নিশান উড়িতে লাগিল, শঙ্খ ও রণবাদ্য বাজিতে লাগিল এবং খুড়াসাহেবের শ্বেত গুম্ফের নীচে শ্বেত হাস্য পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

খুড়াসাহেবের কী আনন্দের দিন! আজ দিল্লীশ্বরের রাজপুত সৈন্যেরা বিজয়গড়ের অতিথি হইয়াছে, প্রবলপ্রতাপান্বিত শাসুজা আজ বিজয়গড়ের বন্দী। কার্তবীর্যার্জুনের পর হইতেই বিজয়গড়ে এমন বন্দী আর মেলে নাই। কার্তবীর্যার্জুনের বন্ধনদশা স্মরণ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া খুড়াসাহেব রাজপুত সুচেতসিংহকে বলিলেন, "মনে করিয়া দেখো, হাজারটা হাতে শিকলি পরাইতে কী আয়োজনটাই করিতে হইয়াছিল। কলিযুগ পড়িয়া অবধি ধুমধাম বিলকুল কমিয়া গিয়াছে। এখন রাজার ছেলেই হউক আর বাদশাহের ছেলেই হউক বাজারে দুখানার বেশি হাত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাঁচিয়া সুখ নাই।"

সুচেতসিংহ হাসিয়া নিজের হাতের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এই দুইখানা হাতই যথেষ্ট।"

খুড়াসাহেব কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন, "তা বটে, সেকালের কাজ ছিল ঢের বেশি। আজকাল কাজ এত কম পড়িয়াছে যে, এই দুইখানা হাতেরই কোনো কৈফিয়ত দেওয়া যায় না। আরও হাত থাকিলে আরও গোঁফে তা দিতে হইত।"

আজ খুড়াসাহেবের বেশভূষার ত্রুটি ছিল না। চিবুকের নীচে হইতে পাকা দাড়ি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহার দুই কানে লটকাইয়া দিয়াছেন। গোঁফজোড়া পাকাইয়া কর্ণরন্ধ্রের কাছাকাছি লইয়া গিয়াছেন। মাথায় বাঁকা পাগড়ি, কটিদেশে বাঁকা তলোয়ার। জরির জুতার সম্মুখভাগ শিঙের মতো বাঁকিয়া পাকাইয়া উঠিয়াছে। আজ খুড়াসাহেবের চলিবার এমনি ভঙ্গি, যেন বিজয়গড়ের মহিমা তাঁহারই সর্বাঙ্গে তরঙ্গিত হইতেছে। আজ এই-সমস্ত সমজদার লোকের নিকটে বিজয়গড়ের মাহাত্ম্য প্রমাণ হইয়া যাইবে, এই আনন্দে তাঁহার আহার-নিদ্রা নাই।

সুচেতসিংহকে লইয়া প্রায় সমস্ত দিন দুর্গ পর্যবেক্ষণ করিলেন। সুচেতসিংহ যেখানে কোনো প্রকার আশ্চর্য প্রকাশ না করেন সেখানে খুড়াসাহেব স্বয়ং "বাহবা বাহবা" করিয়া নিজের উৎসাহ রাজপুত বীরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করেন। বিশেষতঃ দুর্গপ্রাকারের গাঁথুনি সম্বন্ধে তাঁহাকে সবিশেষ পরিশ্রম করিতে হইল। দুর্গপ্রাকার যেরূপ অবিচলিত সুচেতসিংহও ততোধিক—তাঁহার মুখে কোনো প্রকারই ভাব প্রকাশ পাইল না। খুড়াসাহেব ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাকে একবার দুর্গ-প্রাকারের বামে একবার দক্ষিণে, একবার উপরে একবার নীচে, আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিলেন— বারবার বলিতে লাগিলেন,"কী তারিফ।" কিন্তু কিছুতেই সুচেতসিংহের হৃদয়-দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্ত হইয়া সুচেতসিংহ বলিয়া উঠিলেন, "আমি ভরতপুরের গড় দেখিয়াছি,আর-কোনো গড় আমার চোখে লাগেই না!"

খুড়াসাহেব কাহারও সঙ্গে কখনো বিবাদ করেন না; নিতান্ত ম্লান হইয়া বলিলেন, "অবশ্য, অবশ্য। এ কথা বলিতে পার' বটে।"

নিশ্বাস ফেলিয়া দুর্গ সম্বন্ধে আলোচনা পরিত্যাগ করিলেন। বিক্রম-সিংহের পূর্বপুরুষ দুর্গাসিংহের কথা উঠাইলেন। তিনি বলিলেন, "দুর্গা-সিংহের তিন পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র চিত্রসিংহের এক আশ্চর্য অভ্যাস ছিল। তিনি প্রতিদিন প্রাতে আধ সের আন্দাজ ছোলা দুধে সিদ্ধ করিয়া খাইতেন। তাঁহার শরীরও তেমনি ছিল। আচ্ছা জি, তুমি যে ভরতপুরের গড়ের কথা বলিতেছ, সে অবশ্য খুব মস্ত গড়ই হইবে— কিন্তু কই, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে তো তাহার কোনো উল্লেখ নাই?"

সুচেতসিংহ হাসিয়া কহিলেন,"তাহার জন্য কাজের কোনো ব্যাঘাত হইতেছে না।"

খুড়াসাহেব কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিলেন,"হা হা হা, তা ঠিক,তা ঠিক। তবে কি জান, ত্রিপুরার গড়ও বড়ো কম নহে, কিন্তু বিজয়গড়ের—"

সুচেতসিংহ। ত্রিপুরা আবার কোন্ মুল্লুকে ?

খুড়াসাহেব। সে ভারি মুল্লুক। অত কথায় কাজ কী, সেখানকার রাজপুরোহিত ঠাকুর আমাদের গড়ে অতিথি আছেন, তুমি তাঁহার মুখে সমস্ত শুনিবে।

কিন্তু ব্রাহ্মণকে আজ কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। খুড়াসাহেবের প্রাণ সেই ব্রাহ্মণের জন্য কাঁদিতে লাগিল। তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 'এই রাজপুত গ্রাম্যগুলোর চেয়ে সে ব্রাহ্মণ অনেক ভালো।' সুচেতসিংহের নিকটে শতমুখে রঘুপতির প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বিজয়গড় সম্বন্ধে রঘুপতির কী মত তাহাও ব্যক্ত করিলেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

খুড়াসাহেবের হাত এড়াইতে সুচেতসিংহকে আর অধিক প্রয়াস পাইতে হইল না। কাল প্রাতে বন্দীসমেত সম্রাট-সৈন্যের যাত্রার দিন স্থির হইয়াছে, যাত্রার আয়োজনে সৈন্যেরা নিযুক্ত হইল। বন্দীশালায় শাসুজা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে কহিতেছেন, 'ইহারা কী বেআদব! শিবির হইতে আমার আলবোলাটা আনিয়া দিবে, তাহাও ইহাদের মনে উদয় হইল না।'

বিজয়গড়ের পাহাড়ের নিম্নভাগে এক গভীর খাল আছে। সেই খালের ধারে এক স্থানে একটি বজ্রদগ্ধ অশ্বত্থের গুঁড়ি আছে। সেই গুঁড়ির কাছ-বরাবর রঘুপতি গভীর রাত্রে ডুব দিলেন ও অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

গোপনে দুর্গপ্রবেশের জন্য যে সুরঙ্গ-পথ আছে এই খালের গভীর তলেই তাহার প্রবেশের মুখ। এই পথ বাহিয়া সুরঙ্গ-প্রান্তে পৌঁছিয়া নীচে হইতে সবলে ঠেলিলেই একটি পাথর উঠিয়া পড়ে, উপর হইতে

তাহাকে কিছুতেই উঠানো যায় না। সুতরাং যাহারা দুর্গের ভিতরে আছে তাহারা এ পথ দিয়া বাহির হইতে পারে না।

বন্দীশালার পালঙ্কের উপর সুজা নিদ্রিত। পালঙ্ক ছাড়া গৃহে আর কোনো সজ্জা নাই। একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। সহসা গৃহে ছিদ্র প্রকাশ পাইল। অল্পে অল্পে মাথা তুলিয়া পাতাল হইতে রঘুপতি উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ ভিজা। সিক্ত বস্ত্র হইতে জলধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। রঘুপতি ধীরে ধীরে সুজাকে স্পর্শ করিলেন।

সুজা চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু রগড়াইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন; তার পর আলস্যজড়িত স্বরে কহিলেন, "কী হাঙ্গাম! ইহারা কি আমাকে রাত্রেও ঘুমাইতে দিবে না!—তোমাদের ব্যবহারে আমি আশ্চর্য হইয়াছি।"

রঘুপতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "শাহাজাদা, উঠিতে আজ্ঞা হউক। আমি সেই ব্রাহ্মণ। আমাকে স্মরণ করিয়া দেখুন। ভবিষ্যতেও আমাকে স্মরণে রাখিবেন।"

পরদিন প্রাতে সম্রাট্-সৈন্য যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। সুজাকে নিদ্রা হইতে জাগাইবার জন্য রাজা জয়সিংহ স্বয়ং বন্দীশালায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সুজা তখনও শয্যা হইতে উঠেন নাই। কাছে গিয়া স্পর্শ করিলেন। দেখিলেন, সুজা নহে, তাঁহার বস্ত্র পড়িয়া আছে। সুজা নাই। ঘরের মেঝের মধ্যে সুরঙ্গ-গহ্বর, তাহার প্রস্তর-আবরণ উন্মুক্ত পড়িয়া আছে।

বন্দীর পলায়নবার্তা দুর্গে রাষ্ট্র হইল। সন্ধানের জন্য চারি দিকে লোক ছুটিল। রাজা বিক্রমসিংহের শির নত হইল। বন্দী কিরূপে পলাইল তাহার বিচারের জন্য সভা বসিল।

খুড়াসাহেবের সেই গর্বিত সহর্ষ ভাব কোথায় গেল! তিনি পাগলের মতো 'ব্রাহ্মণ কোথায়' 'ব্রাহ্মণ কোথায়' করিয়া রঘুপতিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। ব্রাহ্মণ কোথাও নাই। পাগড়ি খুলিয়া খুড়াসাহেব

কিছুকাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। সুচেতসিংহ পাশে আসিয়া বসিলেন ; কহিলেন, "খুড়াসাহেব, কী আশ্চর্য কারখানা! এ কি সমস্ত ভূতের কাণ্ড ?"

খুড়াসাহেব বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "না, এ ভূতের কাণ্ড নয়, সুচেতসিংহ! এ একজন নিতান্ত নির্বোধ বৃদ্ধের কাণ্ড ও আর-একজন বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ডের কাজ।"

সুচেতসিংহ আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "তুমি যদি তাহাদের জানই তবে তাহাদের গ্রেফ্‌তার করিয়া দাও-না কেন!"

খুড়াসাহেব কহিলেন, "তাহাদের মধ্যে একজন পালাইয়াছে। আর-একজনকে গ্রেফ্‌তার করিয়া রাজসভায় লইয়া যাইতেছি।" বলিয়া পাগড়ি পরিলেন ও রাজসভার বেশ ধারণ করিলেন।

সভায় তখন প্রহরীদের সাক্ষ্য লওয়া হইতেছিল। খুড়াসাহেব নতশিরে সভায় প্রবেশ করিলেন। বিক্রমসিংহের পদতলে তলোয়ার খুলিয়া রাখিয়া কহিলেন, "আমাকে বন্দী করিতে আদেশ করুন, আমি অপরাধী।"

রাজা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "খুড়াসাহেব, ব্যাপার কী ?"

খুড়াসাহেব কহিলেন, "সেই ব্রাহ্মণ। এ সমস্ত সেই বাঙালি ব্রাহ্মণের কাজ।"

রাজা জয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

খুড়াসাহেব কহিলেন, "আমি বিজয়গড়ের বৃদ্ধ খুড়াসাহেব।"

জয়সিংহ। তুমি কী করিয়াছ ?

খুড়াসাহেব। আমি বিজয়গড়ের সন্ধান ভেদ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছি। আমি নিতান্ত নির্বোধের মতো বিশ্বাস করিয়া বাঙালি ব্রাহ্মণকে সুরঙ্গপথের কথা বলিয়াছিলাম—

বিক্রমসিংহ সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, "খড়্গাসিং!"

খুড়াসাহেব চমকিয়া উঠিলেন; তিনি প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার নাম খড়্গসিং।

বিক্রমসিংহ কহিলেন, "খড়্গসিং, এত দিন পরে তুমি কি আবার শিশু হইয়াছ!"

খুড়াসাহেব নতশিরে চুপ করিয়া রহিলেন।

বিক্রমসিংহ। খুড়াসাহেব, তুমি এই কাজ করিলে! তোমার হাতে আজ বিজয়গড়ের অপমান হইল।

খুড়াসাহেব চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার হাত থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কম্পিতহস্তে কপাল স্পর্শ করিয়া মনে মনে কহিলেন 'অদৃষ্ট'।

বিক্রমসিংহ কহিলেন, "আমার দুর্গ হইতে দিল্লীশ্বরের শত্রু পলায়ন করিল!—জান, তুমি আমাকে দিল্লীশ্বরের নিকটে অপরাধী করিয়াছ!"

খুড়াসাহেব কহিলেন, "আমিই একা অপরাধী। মহারাজ অপরাধী কথা দিল্লীশ্বর বিশ্বাস করিবেন না।"

বিক্রমসিংহ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি কে! তোমার খবর দিল্লীশ্বর কী রাখেন! তুমি তো আমারই লোক। এ যেন আমি নিজের হাতে বন্দীর বন্ধন মোচন করিয়া দিয়াছি।"

খুড়াসাহেব নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তিনি চোখের জল আর সামলাইতে পারিলেন না।

বিক্রমসিংহ কহিলেন, "তোমাকে কী দণ্ড দিব?"

খুড়াসাহেব। মহারাজের যেমন ইচ্ছা।

বিক্রমসিংহ। তুমি বুড়ামানুষ, তোমাকে অধিক আর কী দণ্ড দিব —নির্বাসনদণ্ডই তোমার পক্ষে যথেষ্ট।

খুড়াসাহেব বিক্রমসিংহের পা জড়াইয়া ধরিলেন; কহিলেন,

"বিজয়গড় হইতে নির্বাসন! না মহারাজ, আমি বৃদ্ধ, আমার মতিভ্রম হইয়াছিল! আমাকে বিজয়গড়েই মরিতে দিন। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ করিয়া দিন। এই বুড়া বয়সে শেয়াল-কুকুরের মতো আমাকে বিজয়গড় হইতে খেদাইয়া দিবেন না।"

রাজা জয়সিংহ কহিলেন, "মহারাজ, আমার অনুরোধে ইহার অপরাধ মার্জনা করুন। আমি সম্রাটকে সমস্ত অবস্থা অবগত করিব।"

খুড়াসাহেবের মার্জনা হইল। সভা হইতে বাহির হইবার সময় খুড়াসাহেব কাঁপিয়া পড়িয়া গেলেন। সেদিন হইতে খুড়াসাহেবকে আর বড়ো একটা দেখা যাইত না; তিনি ঘর হইতে বাহির হইতেন না। তাঁহার মেরুদণ্ড যেন ভাঙিয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

গুজুরপাড়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে ক্ষুদ্র গ্রাম। একজন ক্ষুদ্র জমিদার আছেন, নাম পীতাম্বর রায়—বাসিন্দা অধিক নাই। পীতাম্বর আপনার পুরাতন চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আপনাকে রাজা বলিয়া থাকেন। তাঁহার প্রজারাও তাঁহাকে রাজা বলিয়া থাকেন। তাঁহার রাজমহিমা এই আম্র-পিয়াল-বন-বেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রামটুকুর মধ্যেই বিরাজমান। তাঁহার যশ এই গ্রামের নিকুঞ্জগুলির মধ্যে ধ্বনিত হইয়া এই গ্রামেরই সীমানার মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। জগতের বড়ো বড়ো রাজাধিরাজের প্রখর প্রতাপ এই ছায়াময় নীড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না। কেবল তীর্থস্নানের উদ্দেশ্যে নদীতীরে ত্রিপুরার রাজাদের এক বৃহৎ প্রাসাদ আছে, কিন্তু অনেক কাল হইতে রাজারা কেহ স্নানে আসেন নাই, সুতরাং ত্রিপুরার রাজার সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট জনশ্রুতি প্রচলিত আছে মাত্র।

একদিন ভাদ্রমাসের দিনে গ্রামে সংবাদ আসিল, ত্রিপুরার এক রাজকুমার নদীতীরের পুরাতন প্রাসাদে বাস করিতে আসিতেছেন। কিছু

দিন পরে বিস্তর পাগড়িবাঁধা লোক আসিয়া প্রাসাদে ভারি ধুম লাগাইয়া দিল। তাহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে হাতি-ঘোড়া লোক-লস্কর লইয়া স্বয়ং নক্ষত্ররায় গুজুরপাড়া গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমারোহ দেখিয়া গ্রামবাসীদের মুখে রা সরিল না। পীতাম্বরকে এতদিন ভারি রাজা বলিয়া মনে হইত, কিন্তু আজ আর তাহা কাহারও মনে হইল না— নক্ষত্ররায়কে দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিল, "হাঁ, রাজপুত্র এই রকমই হয় বটে।"

এইরূপে পীতাম্বর তাঁহার পাকা দালান ও চণ্ডীমণ্ডপ-শুদ্ধ একেবারে লুপ্ত হইয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। নক্ষত্ররায়কে তিনি এমনি রাজা বলিয়া অনুভব করিলেন যে, নিজের ক্ষুদ্র রাজমহিমা নক্ষত্ররায়ের চরণে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া তিনি পরম সুখী হইলেন। নক্ষত্ররায় কদাচিৎ হাতি চড়িয়া বাহির হইলে পীতাম্বর আপনার প্রজাদের ডাকিয়া বলিতেন, "রাজা দেখেছিস ? ঐ দেখ্, রাজা দেখ্।" মাছ-তরকারি আহার্যদ্রব্য উপহার লইয়া পীতাম্বর প্রতিদিন নক্ষত্ররায়কে দেখিতে আসিতেন— নক্ষত্ররায়ের তরুণ সুন্দর মুখ দেখিয়া পীতাম্বরের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। নক্ষত্ররায়ই গ্রামের রাজা হইয়া উঠিলেন। পীতাম্বর প্রজাদের মধ্যে গিয়া ভর্তি হইলেন।

প্রতিদিন তিন বেলা নহবত বাজিতে লাগিল, গ্রামের পথে হাতি-ঘোড়া চলিতে লাগিল, রাজদ্বারে মুক্ত তরবারির বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল, হাটবাজার বসিয়া গেল। পীতাম্বর এবং তাঁহার প্রজারা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। নক্ষত্ররায় এই নির্বাসনের রাজা হইয়া উঠিয়া সমস্ত দুঃখ ভুলিলেন। (এখানে রাজত্বের ভার কিছুমাত্র নাই, অথচ রাজত্বের সুখ সম্পূর্ণ আছে। এখানে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বদেশে তাঁহার এত প্রবল প্রতাপ ছিল না।) তাহা ছাড়া এখানে রঘুপতির ছায়া নাই। মনের উল্লাসে নক্ষত্ররায় বিলাসে মগ্ন হইলেন। ঢাকা নগরী হইতে নটনটী আসিল, নৃত্যগীতবাদ্যে নক্ষত্ররায়ের তিলেক অরুচি নাই।

নক্ষত্ররায় ত্রিপুরার রাজ-অনুষ্ঠান সমস্তই অবলম্বন করিলেন। ভৃত্যদের মধ্যে কাহারও নাম রাখিলেন মন্ত্রী, কাহারও নাম রাখিলেন সেনাপতি, পীতাম্বর দেওয়ানজি নামে চলিত হইলেন। রীতিমত রাজদরবারে বসিয়া নক্ষত্ররায় পরম আড়ম্বরে বিচার করিতেন। নকুড় আসিয়া নালিশ করিল, "মথুর আমায় 'কুত্তো' কয়েছে।" তাহার বিধিমত বিচার বসিল। বিবিধ প্রমাণ-সংগ্রহের পর মথুর দোষী সাব্যস্ত হইলে নক্ষত্ররায় পরম গম্ভীরভাবে বিচারাসন হইতে আদেশ করিলেন—নকুড় মথুরকে দুই কানমলা দেয়। এইরূপে সুখে সময় কাটিতে লাগিল। এক-একদিন হাতে নিতান্ত কাজ না থাকিলে সৃষ্টিছাড়া একটা কোনো নূতন আমোদ উদ্ভাবনের জন্য মন্ত্রীকে তলব পড়িত। মন্ত্রী রাজসভাসদ্‌-দিগকে সমবেত করিয়া নিতান্ত উদ্‌বিগ্ন ব্যাকুল ভাবে নূতন খেলা বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, গভীর চিন্তা ও পরামর্শের অবধি থাকিত না। একদিন সৈন্যসামন্ত লইয়া পীতাম্বরের চণ্ডীমণ্ডপ আক্রমণ করা হইয়াছিল, এবং তাঁহার পুকুর হইতে মাছ ও তাঁহার বাগান হইতে ডাব ও পালং শাক লুঠের দ্রব্যের স্বরূপ অত্যন্ত ধুম করিয়া বাদ্য বাজাইয়া প্রাসাদে আনা হইয়াছিল। এইরূপ খেলাতে নক্ষত্ররায়ের প্রতি পীতাম্বরের স্নেহ আরও গাঢ় হইত।

আজ প্রাসাদে বিড়াল-শাবকের বিবাহ। নক্ষত্ররায়ের একটি শিশু-বিড়ালী ছিল, তাহার সহিত মণ্ডলদের বিড়ালের বিবাহ হইবে। চুড়োমণি ঘটক ঘটকালির স্বরূপ তিন শত টাকা ও একটা শাল পাইয়াছে। গায়েহলুদ প্রভৃতি সমস্ত উপক্রমণিকা হইয়া গিয়াছে। আজ শুভ লগ্নে সন্ধ্যার সময় বিবাহ হইবে। এ কয়দিন রাজবাটীতে কাহারও তিলার্ধ অবসর নাই।

সন্ধ্যার সময় পথঘাট আলোকিত হইল, নহবত বসিল। মণ্ডলদের বাড়ি হইতে চতুর্দোলায় চড়িয়া কিংখাবের বেশ পরিয়া পাত্র অতি কাতরস্বরে মিউ-মিউ করিতে করিতে যাত্রা করিয়াছে। মণ্ডলদের বাড়ির

ছোটো ছেলেটি মিত-বরের মতো তাহার গলার দড়িটি ধরিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। উলু-শঙ্খধ্বনির মধ্যে পাত্র সভাস্থ হইল।

পুরোহিতের নাম কেনারাম, কিন্তু নক্ষত্ররায় তাহার নাম রাখিয়াছিলেন রঘুপতি। নক্ষত্ররায় আসল রঘুপতিকে ভয় করিতেন, এইজন্য নকল রঘুপতিকে লইয়া খেলা করিয়া সুখী হইতেন। এমন-কি, কথায় কথায় তাহাকে উৎপীড়ন করিতেন; গরিব কেনারাম সমস্ত নীরবে সহ্য করিত। আজ দৈবদুর্বিপাকে কেনারাম সভায় অনুপস্থিত— তাহার ছেলেটি জ্বরবিকারে মরিতেছে।

নক্ষত্ররায় অধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রঘুপতি কোথায়?"

ভৃত্য বলিল, "তাহার বাড়িতে ব্যামো।"

নক্ষত্ররায় দ্বিগুণ হাঁকিয়া বলিলেন, "বোলাও উস্‌কো।"

লোক ছুটিল। ততক্ষণ রোরুদ্যমান বিড়ালের সমক্ষে নাচগান চলিতে লাগিল।

নক্ষত্ররায় বলিলেন, "সাহানা গাও।" সাহানা গান আরম্ভ হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভৃত্য আসিয়া নিবেদন করিল, "রঘুপতি আসিয়াছেন।"

নক্ষত্ররায় সরোষে বলিলেন, "বোলাও।"

তৎক্ষণাৎ পুরোহিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। পুরোহিতকে দেখিয়াই নক্ষত্ররায়ের ভ্রূকুটি কোথায় মিলাইয়া গেল, তাঁহার সম্পূর্ণ ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, কপালে ঘর্ম দেখা দিল। সাহানা গান সারঙ্গ ও মৃদঙ্গ সহসা বন্ধ হইল, কেবল বিড়ালের মিউ-মিউ ধ্বনি নিস্তব্ধ ঘরে দ্বিগুণ জাগিয়া উঠিল।

এ রঘুপতিই বটে। তাহার আর সন্দেহ নাই। দীর্ঘ, শীর্ণ, তেজস্বী, বহুদিনের ক্ষুধিত কুকুরের মতো চক্ষু দুটো জ্বলিতেছে। ধুলায় পরিপূর্ণ দুই পা তিনি কিংখাব-মছলন্দের উপর স্থাপন করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "নক্ষত্ররায়!"

নক্ষত্ররায় চুপ করিয়া রহিলেন।

রঘুপতি বলিলেন, "তুমি রঘুপতিকে ডাকিয়াছ। আমি আসিয়াছি।"

নক্ষত্ররায় অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন, "ঠাকুর— ঠাকুর!"

রঘুপতি কহিলেন, "উঠিয়া এসো।"

নক্ষত্ররায় ধীরে ধীরে সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। বিড়ালের বিয়ে সাহানা এবং সারঙ্গ একেবারে বন্ধ হইল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

রঘুপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-সব কী হইতেছিল?"

নক্ষত্ররায় মাথা চুলকাইয়া কহিলেন, "নাচ হইতেছিল।"

রঘুপতি ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া কহিলেন, "ছী ছি!"

নক্ষত্ররায় অপরাধীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "কাল এখান হইতে যাত্রা করিতে হইবে। তাহার উদ্যোগ করো।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "কোথায় যাইতে হইবে?"

রঘুপতি। সে কথা পরে হইবে। আপাতত আমার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়ো।

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আমি এখানে বেশ আছি।"

রঘুপতি। 'বেশ আছি'! তুমি রাজবংশে জন্মিয়াছ, তোমার পূর্বপুরুষেরা সকলে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন। তুমি কিনা আজ এই বনগাঁয়ে শেয়াল-রাজা হইয়া বসিয়াছ আর বলিতেছ 'বেশ আছি'!

রঘুপতি তীব্র বাক্যে ও তীক্ষ্ণ কটাক্ষে প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, নক্ষত্ররায় ভালো নাই। নক্ষত্ররায়ও রঘুপতির মুখের তেজে কতকটা সেই রকমই বুঝিলেন। তিনি বলিলেন, "বেশ আর কী এমন আছি! কিন্তু আর কী করিব? উপায় কী আছে?"

রঘুপতি। উপায় ঢের আছে, উপায়ের অভাব নাই। আমি তোমাকে উপায় দেখাইয়া দিব— তুমি আমার সঙ্গে চলো।

নক্ষত্ররায়। একবার দেওয়ানজিকে জিজ্ঞাসা করি।

রঘুপতি। না।

নক্ষত্ররায়। আমার এই-সব জিনিসপত্র—

রঘুপতি। কিছু আবশ্যক নাই।

নক্ষত্ররায়। লোকজন—

রঘুপতি। দরকার নাই।

নক্ষত্ররায়। আমার হাতে এখন যথেষ্ট নগদ টাকা নাই।

রঘুপতি। আমার আছে। আর অধিক ওজর আপত্তি করিয়ো না।— আজ শয়ন করিতে যাও, কাল প্রাতঃকালেই যাত্রা করিতে হইবে।

বলিয়া রঘুপতি কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার পরদিন ভোরে নক্ষত্ররায় উঠিয়াছেন। তখন বন্দীরা ললিত রাগিণীতে মধুর গান গাহিতেছে। নক্ষত্ররায় বহির্ভবনে আসিয়া জানালা হইতে বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন। পূর্বতীরে সূর্যোদয় হইতেছে, অরুণরেখা দেখা দিয়াছে। উভয় তীরের ঘন তরুস্রোতের মধ্য দিয়া, ছোটো ছোটো নিদ্রিত গ্রামগুলির দ্বারের কাছ দিয়া, ব্রহ্মপুত্র তাহার বিপুল জলরাশি লইয়া অবাধে বহিয়া যাইতেছে। প্রাসাদের জানালা হইতে নদীতীরের একটি ছোটো কুটির দেখা যাইতেছে। একটি মেয়ে প্রাঙ্গণ ঝাঁট দিতেছে— একজন পুরুষ তাহার সঙ্গে দুই-একটা কথা কহিয়া, মাথায় চাদর বাঁধিয়া, একটা বড়ো বাঁশের লাঠির অগ্রভাগে পুঁটুলি বাঁধিয়া, নিশ্চিন্ত মনে কোথায় বাহির হইল। শ্যামা ও দোয়েল শিস্ দিতেছে, বেনে-বউ বড়ো কাঁঠাল গাছের ঘন পল্লবের মধ্যে বসিয়া গান গাহিতেছে। বাতায়নে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া নক্ষত্র-রায়ের হৃদয় হইতে এক গভীর দীর্ঘনিশ্বাস উঠিল, এমন সময়ে পশ্চাৎ

হইতে রঘুপতি আসিয়া নক্ষত্ররায়কে স্পর্শ করিলেন। নক্ষত্ররায় চমকিয়া উঠিলেন। রঘুপতি মৃদুগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "যাত্রার সমস্ত প্রস্তুত।"

নক্ষত্ররায় জোড়হাতে অত্যন্ত কাতর স্বরে কহিলেন, "ঠাকুর, আমাকে মাপ করো, ঠাকুর— আমি কোথাও যাইতে চাহি না। আমি এখানে বেশ আছি।"

রঘুপতি একটি কথা না বলিয়া নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে তাঁহার অগ্নিদৃষ্টি স্থির রাখিলেন। নক্ষত্ররায় চোখ নামাইয়া কহিলেন, "কোথায় যাইতে হইবে?"

রঘুপতি। সে কথা এখন হইতে পারে না।

নক্ষত্র। দাদার বিরুদ্ধে আমি কোনো চক্রান্ত করিতে পারিব না।

রঘুপতি জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, "দাদা তোমার কী মহৎ উপকারটা করিয়াছেন শুনি।"

নক্ষত্র মুখ ফিরাইয়া, জানালার উপর আঁচড় কাটিয়া বলিলেন, "আমি জানি, তিনি আমাকে ভালোবাসেন।"

রঘুপতি তীব্র শুষ্ক হাস্যের সহিত কহিলেন, "হরি হরি! কী প্রেম! তাই বুঝি নির্বিঘ্নে ধ্রুবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য মিছা ছুতা করিয়া দাদা তোমাকে রাজ্য হইতে তাড়াইলেন— পাছে রাজ্যের গুরুভারে ননির পুতলি স্নেহের ভাই কখনো ব্যথিত হইয়া পড়ে! সে রাজ্যে আর কি কখনো সহজে প্রবেশ করিতে পারিবে? নির্বোধ!"

নক্ষত্ররায় তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আমি কি এই সামান্য কথাটা আর বুঝি না? আমি সমস্তই বুঝি— কিন্তু আমি কী করিব বলো ঠাকুর, উপায় কী?"

রঘুপতি। সেই উপায়ের কথাই তো হইতেছে। সেইজন্যই তো আসিয়াছি। ইচ্ছা হয় তো আমার সঙ্গে চলিয়া আইস, নয় তো এই

বাঁশবনের মধ্যে বসিয়া বসিয়া তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী দাদার ধ্যান করো। আমি চলিলাম।

বলিয়া রঘুপতি প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। নক্ষত্ররায় তাড়াতাড়ি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া কহিলেন, "আমিও যাইব ঠাকুর, কিন্তু দেওয়ানজি যদি যাইতে চান তাঁহাকে আমাদের সঙ্গে লইয়া যাইতে কি আপত্তি আছে?"

রঘুপতি কহিলেন, "আমি ছাড়া আর কেহ সঙ্গে যাইবে না।"

বাড়ি ছাড়িয়া নক্ষত্ররায়ের পা সরিতে চায় না। এই-সমস্ত সুখের খেলা ছাড়িয়া, দেওয়ানজিকে ছাড়িয়া, রঘুপতির সঙ্গে একলা কোথায় যাইতে হইবে! কিন্তু রঘুপতি যেন তাঁহার কেশ ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। তাহা ছাড়া নক্ষত্ররায়ের মনে একপ্রকার ভয়মিশ্রিত কৌতূহলও জন্মিতে লাগিল। তাহারও একটা ভীষণ আকর্ষণ আছে।

নৌকা প্রস্তুত আছে। নদীতীরে উপস্থিত হইয়া নক্ষত্ররায় দেখিলেন, কাঁধে গামছা ফেলিয়া পীতাম্বর স্নান করিতে আসিতেছেন। নক্ষত্রকে দেখিয়াই পীতাম্বর হাস্যবিকশিত মুখে কহিলেন, "জয়োস্তু মহারাজ, শুনিলাম নাকি কাল কোথা হইতে এক অলক্ষণমন্ত বিটল ব্রাহ্মণ আসিয়া শুভবিবাহের ব্যাঘাত করিয়াছে?"

নক্ষত্ররায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। রঘুপতি গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "আমিই সেই বিটল ব্রাহ্মণ।"

পীতাম্বর হাসিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "তবে তো আপনার সাক্ষাতে আপনার বর্ণনা করাটা ভালো হয় নাই। জানিলে কোন্ পিতার পুত্র এমন কাজ করিত! কিছু মনে করিবেন না ঠাকুর, অসাক্ষাতে লোকে কী না বলে? আমাকে যাহারা সম্মুখে বলে রাজা তাহারা আড়ালে বলে পিতু। মুখের সামনে কিছু না বলিলেই হইল, আমি তো এই বুঝি। আসল কথা কী জানেন, আপনার মুখটা কেমন ভারী অপ্রসন্ন

দেখাইতেছে, কাহারও এমন মুখের ভাব দেখিলে লোকে তাহার নামে নিন্দা রটায়।— মহারাজ, এত প্রাতে যে নদীতীরে ?”

নক্ষত্ররায় কিছু করুণ স্বরে কহিলেন, “আমি যে চলিলাম দেওয়ানজি !”

পীতাম্বর। চলিলেন ! কোথায় ? ন-পাড়ায় মণ্ডলদের বাড়ি ?

নক্ষত্র। না দেওয়ানজি, মণ্ডলদের বাড়ি নয়। অনেক দূর।

পীতাম্বর। অনেকদূর ! তবে কি পাইকঘাটায় শিকারে যাইতেছেন ?

নক্ষত্ররায় একবার রঘুপতির মুখের দিকে চাহিয়া কেবল বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িলেন।

রঘুপতি কহিলেন, “বেলা বহিয়া যায়, নৌকায় উঠা হউক।”

পীতাম্বর অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ও ক্রুদ্ধ ভাবে ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিলেন ; কহিলেন, “তুমি কে হে ঠাকুর ? আমাদের মহারাজকে হুকুম করিতে আসিয়াছ !”

নক্ষত্র ব্যস্ত হইয়া পীতাম্বরকে এক পাশে টানিয়া লইয়া কহিলেন, “উনি আমাদের গুরুঠাকুর।”

পীতাম্বর বলিয়া উঠিলেন, “হোক-না গুরুঠাকুর। উনি আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে থাকুন, চাল-কলা বরাদ্দ করিয়া দিব, সমাদরে থাকিবেন— মহারাজকে উহার কিসের আবশ্যক ?”

রঘুপতি। বৃথা সময় নষ্ট হইতেছে— আমি তবে চলিলাম।

পীতাম্বর। যে আজ্ঞে, বিলম্বে ফল কী, মশাই চট্‌পট্‌ সরিয়া পড়ুন। মহারাজকে লইয়া আমি প্রাসাদে যাইতেছি।

নক্ষত্ররায় একবার রঘুপতির মুখের দিকে চাহিয়া, একবার পীতাম্বরের মুখের দিকে চাহিয়া, মৃদুস্বরে কহিলেন, “না দেওয়ানজি, আমি যাই।”

পীতাম্বর। তবে আমিও যাই, লোকজন সঙ্গে লউন। রাজার মতো চলুন। রাজা যাইবেন, সঙ্গে দেওয়ানজি যাইবে না ?

নক্ষত্ররায় কেবল রঘুপতির মুখের দিকে চাহিলেন। রঘুপতি কহিলেন, "কেহ সঙ্গে যাইবে না।"

পীতাম্বর উগ্র হইয়া কহিলেন, "দেখো ঠাকুর, তুমি—"

নক্ষত্ররায় তাঁহাকে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, "দেওয়ানজি, আমি যাই দেরি হইতেছে।"

পীতাম্বর ম্লান হইয়া নক্ষত্রের হাত ধরিয়া কহিলেন, "দেখো বাবা, আমি তোমাকে রাজা বলি, কিন্তু আমি তোমাকে সন্তানের মতো ভালোবাসি— আমার সন্তান কেহ নাই; তোমার উপর আমার জোর খাটে না। তুমি চলিয়া যাইতেছ, আমি জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারি না। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ এই আছে, যেখানেই যাও আমি মরিবার আগে ফিরিয়া আসিতে হইবে। আমি স্বহস্তে আমার রাজত্ব সমস্ত তোমার হাতে দিয়া যাইব, আমার এই একটি সাধ আছে।"

নক্ষত্ররায় ও রঘুপতি নৌকায় উঠিলেন। নৌকা দক্ষিণমুখে চলিয়া গেল। পীতাম্বর স্নান ভুলিয়া, গামছা কাঁধে অন্যমনস্কে বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। গুজুরপাড়া যেন শূন্য হইয়া গেল; তাহার আমোদ-উৎসব সমস্ত অবসান। কেবল প্রতিদিন প্রকৃতির নিত্য-উৎসব; প্রাতে পাখির গান, পল্লবের মর্মরধ্বনি ও নদীতরঙ্গের করতালির বিরাম নাই।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

দীর্ঘ পথ। কোথাও বা নদী, কোথাও বা ঘন অরণ্য, কোথাও বা ছায়াহীন প্রান্তর— কখনো বা নৌকায়, কখনো বা পদব্রজে, কখনো বা টাট্টু ঘোড়ায়— কখনো রৌদ্র, কখনো বৃষ্টি, কখনো কোলাহলময় দিন, কখনো নিশীথিনীর নিস্তব্ধ অন্ধকার— নক্ষত্ররায় অবিশ্রাম চলিয়াছেন। কত দেশ, কত বিচিত্র দৃশ্য, কত বিচিত্র লোক— কিন্তু নক্ষত্ররায়ের পার্শ্বে ছায়ার ন্যায় ক্ষীণ, রৌদ্রের ন্যায় দীপ্ত সেই একমাত্র রঘুপতি অবিশ্রাম

লাগিয়া আছেন। দিনে রঘুপতি, রাত্রে রঘুপতি, স্বপ্নেও রঘুপতি বিরাজ করেন। পথে পথিকেরা যাতায়াত করিতেছে, পথপার্শ্বে ধূলায় ছেলেরা খেলা করিতেছে, হাটে শত শত লোক কেনাবেচা করিতেছে, গ্রামে বৃদ্ধেরা পাশা খেলিতেছে, ঘাটে মেয়েরা জল তুলিতেছে, নৌকায় মাঝিরা গান গাহিয়া চলিয়াছে— কিন্তু নক্ষত্ররায়ের পার্শ্বে এক শীর্ণ রঘুপতি সর্বদা জাগিয়া আছে। জগতে চারি দিকে বিচিত্র খেলা হইতেছে, বিচিত্র ঘটনা ঘটিতেছে— কিন্তু এই রঙ্গভূমির বিচিত্র লীলার মাঝখান দিয়া নক্ষত্ররায়ের দুরদৃষ্ট তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে— সজন তাঁহার পক্ষে বিজন, লোকালয় কেবল শূন্য মরুভূমি।

নক্ষত্ররায় শ্রান্ত হইয়া তাঁহার পার্শ্ববর্তী ছায়াকে জিজ্ঞাসা করেন 'আর কত দূর যাইতে হইবে?'

ছায়া উত্তর করে, 'অনেক দূর।'

'কোথায় যাইতে হইবে?'

তাহার উত্তর নাই। নক্ষত্ররায় নিশ্বাস ফেলিয়া চলিতে থাকেন। তরুশ্রেণীর মধ্যে পাতা-দিয়া-ছাওয়া নিভৃত পরিচ্ছন্ন কুটির দেখিলে তাঁহার মনে হয়, 'আমি যদি এই কুটিরের অধিবাসী হইতাম!' গোধূলির সময় যখন রাখাল লাঠি কাঁধে করিয়া, মাঠ দিয়া, গ্রামপথ দিয়া, ধুলা উড়াইয়া গোরু-বাছুর লইয়া চলে, নক্ষত্ররায়ের মনে হয়, 'আমি যদি ইহার সঙ্গে যাইতে পারিতাম, সন্ধ্যাবেলায় গৃহে গিয়া বিশ্রাম করিতে পাইতাম!' মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড রৌদ্রে চাষী চাষ করিতেছে, তাহাকে দেখিয়া নক্ষত্ররায় মনে করেন, 'আহা, এ কী সুখী!'

পথকষ্টে নক্ষত্ররায় বিবর্ণ শীর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছেন— রঘুপতিকে বলেন, 'ঠাকুর, আমি আর বাঁচিব না।'

রঘুপতি বলেন, 'এখন তোমাকে মরিতে দিবে কে?'

নক্ষত্ররায়ের মনে হইল, রঘুপতি অবকাশ না দিলে তাঁহার মরিবারও

সুবিধা নাই। একজন স্ত্রীলোক নক্ষত্ররায়কে দেখিয়া বলিয়াছিল, 'আহা, কাদের ছেলে গো! একে পথে কে বাহির করিয়াছে?' শুনিয়া নক্ষত্র রায়ের প্রাণ গলিয়া গেল, তাঁহার চোখে জল আসিল, তাঁহার ইচ্ছা করিল সেই স্ত্রীলোকটিকে মা বলিয়া তাহার সঙ্গে তাহার ঘরে চলিয়া যান।

কিন্তু নক্ষত্ররায় রঘুপতির হাতে যতই কষ্ট পাইতে লাগিলেন রঘুপতির ততই বশ হইতে লাগিলেন; রঘুপতির অঙ্গুলির ইঙ্গিতে তাঁহার সমস্ত অস্তিত্ব পরিচালিত হইতে লাগিল।

চলিতে চলিতে ক্রমে নদীর বাহুল্য কমিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে ভূমি দৃঢ় হইয়া আসিল। মৃত্তিকা লোহিতবর্ণ, কঙ্করময়; লোকালয় দূরে দূরে স্থাপিত; গাছপালা বিরল— নারিকেলবনের দেশ ছাড়িয়া দুই পথিক তালবনের দেশে আসিয়া পড়িলেন। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো বাঁধ; শুষ্ক নদীর পথ; দূরে মেঘের মতো পাহাড় দেখা যাইতেছে। ক্রমে শাসুজার রাজধানী রাজমহল নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

অবশেষে রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরাজয় ও পলায়নের পরে সুজা নূতন সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন— কিন্তু রাজকোষে অধিক অর্থ নাই। প্রজাগণ করভারে পীড়িত। ইতিমধ্যে দারাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ঔরঙ্গজেব দিল্লির সিংহাসনে বসিয়াছেন। সুজা এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। কিন্তু সৈন্যসামন্ত কিছুই প্রস্তুত ছিল না— এইজন্য কিছু সময় হাতে পাইবার আশায় তিনি ছল করিয়া ঔরঙ্গজেবের নিকট এক দূত পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া পাঠাইলেন যে, নয়নের জ্যোতি, হৃদয়ের আনন্দ, পরমস্নেহাস্পদ প্রিয়তম ভ্রাতা ঔরঙ্গজেব সিংহাসনলাভে কৃতকার্য হইয়াছেন, ইহাতে সুজা মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন— এক্ষণে সুজার বাংলা-শাসনভার নূতন

সম্রাট মঞ্জুর করিলেই আনন্দের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। ঔরঙ্গজেব অত্যন্ত সমাদরের সহিত দূতকে আহ্বান করিলেন। সুজার শরীর-মনের স্বাস্থ্য এবং সুজার পরিবারের মঙ্গল-সংবাদ জানিবার জন্য সবিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, যখন স্বয়ং সম্রাট সাজাহান সুজাকে বাংলার শাসনকার্যে নিয়োগ করিয়াছেন তখন আর দ্বিতীয় মঞ্জুরী-পত্রের কোনো আবশ্যক নাই।

এই সময় রঘুপতি সুজার সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুজা কৃতজ্ঞতা ও সমাদরের সহিত তাঁহার উদ্ধারকর্তাকে আহ্বান করিলেন। বলিলেন, "খবর কী ?"

রঘুপতি বলিলেন, "বাদশাহের কাছে কিছু নিবেদন আছে।"

সুজা মনে মনে ভাবিলেন, 'নিবেদন আবার কিসের ? কিছু অর্থ চাহিয়া না বসিলে বাঁচি।'

রঘুপতি কহিলেন, "আমার প্রার্থনা এই যে—"

সুজা কহিলেন, "ব্রাহ্মণ, তোমার প্রার্থনা আমি নিশ্চয় পূরণ করিব। কিন্তু কিছুদিন সবুর করো। এখন রাজকোষে অধিক অর্থ নাই।"

রঘুপতি কহিলেন, "শাহেনশা, রুপা সোনা বা আর কোনো ধাতু চাহি না, আমি এখন শাণিত ইস্পাত চাই। আমার নালিশ শুনুন, আমি বিচার প্রার্থনা করি।"

সুজা কহিলেন, "ভারি মুশকিল! এখন আমার বিচার করিবার সময় নহে। ব্রাহ্মণ, তুমি বড়ো অসময়ে আসিয়াছ।"

রঘুপতি কহিলেন, "শাহজাদা, সময়-অসময় সকলেরই আছে। আপনি বাদশাহ আপনারও আছে, এবং আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমারও আছে। আপনার সময়মত আপনি বিচার করিতে বসিলে আমার সময় থাকে কোথা ?"

সুজা হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "ভারি হাঙ্গাম! এত কথা

শোনার চেয়ে তোমার নালিশ শোনা ভালো। বলিয়া যাও।"

রঘুপতি কহিলেন, "ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে বিনা অপরাধে নির্বাসিত করিয়াছেন—"

সুজা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি পরের নালিশ লইয়া কেন আমার সময় নষ্ট করিতেছ? এখন এ-সমস্ত বিচার করিবার সময় নয়।"

রঘুপতি কহিলেন, "ফরিয়াদি রাজধানীতে হাজির আছেন।"

সুজা কহিলেন, "তিনি আপনি উপস্থিত থাকিয়া আপনার মুখে যখন নালিশ উত্থাপন করিবেন তখন বিবেচনা করা যাইবে।"

রঘুপতি কহিলেন, "তাঁহাকে কবে এখানে হাজির করিব?"

সুজা কহিলেন, "ব্রাহ্মণ কিছুতেই ছাড়ে না। আচ্ছা, এক সপ্তাহ পরে আনিয়ো।"

রঘুপতি কহিলেন, "বাদশাহ যদি হুকুম করেন তো আমি তাঁহাকে কাল আনিব।"

সুজা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, কালই আনিয়ো।" আজিকার মতো নিষ্কৃতি পাইলেন। রঘুপতি বিদায় হইলেন।

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "নবাবের কাছে যাইব, কিন্তু নজরের জন্য কী লইব?"

রঘুপতি কহিলেন, "সেজন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। নজরের জন্য তিনি দেড় লক্ষ মুদ্রা উপস্থিত করিলেন।"

পরদিন প্রভাতে রঘুপতি কম্পিতহৃদয় নক্ষত্ররায়কে লইয়া সুজার সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যখন দেড় লক্ষ টাকা নবাবের পদতলে স্থাপিত হইল তখন তাঁহার মুখশ্রী তেমন অপ্রসন্ন বোধ হইল না। নক্ষত্ররায়ের নালিশ অতি সহজেই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি কহিলেন, "এক্ষণে তোমাদের কী অভিপ্রায় আমাকে বলো।"

রঘুপতি কহিলেন, "গোবিন্দমাণিক্যকে নির্বাসিত করিয়া তাঁহার স্থলে নক্ষত্ররায়কে রাজা করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক।"

যদিও সুজা নিজের ভ্রাতার সিংহাসনে হস্তক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র সংকুচিত হন না, তথাপি এ স্থলে তাঁহার মনে কেমন আপত্তি উপস্থিত হইল। কিন্তু রঘুপতির প্রার্থনা পূরণ করাই তাঁহার আপাতত সকলের চেয়ে সহজ বোধ হইল— নহিলে রঘুপতি বিস্তর বকাবকি করিবে এই তাঁহার ভয়। বিশেষতঃ দেড়লক্ষ টাকা নজরের উপরেও অধিক আপত্তি করা ভালো দেখায় না, এইরূপ তাঁহার মনে হইল। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, গোবিন্দমাণিক্যের নির্বাসন এবং নক্ষত্ররায়ের রাজ্যপ্রাপ্তির পরোয়ানা-পত্র তোমাদের সঙ্গে দিব, তোমরা লইয়া যাও।"

রঘুপতি কহিলেন, "বাদশাহের কতিপয় সৈন্যও সঙ্গে দিতে হইবে।"

সুজা দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "না, না, না— তাহা হইবে না, যুদ্ধবিগ্রহ করিতে পারিব না।"

রঘুপতি কহিলেন, "যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ আরও ছত্রিশ হাজার টাকা আমি রাখিয়া যাইতেছি। এবং ত্রিপুরায় নক্ষত্ররায় রাজা হইবা মাত্র এক বৎসরের খাজনা সেনাপতির হাত দিয়া পাঠাইয়া দিব।"

এই প্রস্তাব সুজার অতিশয় যুক্তিসংগত বোধ হইল, এবং অমাত্যেরাও তাঁহার সহিত একমত হইল। একদল মোগল সৈন্য সঙ্গে লইয়া রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় ত্রিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এই উপন্যাসের আরম্ভকাল হইতে এখন দুই বৎসর হইয়া গিয়াছে। ধ্রুব তখন দুই বৎসরের বালক ছিল, এখন তাহার বয়স চার বৎসর। এখন সে বিস্তর কথা শিখিয়াছে। এখন তিনি আপনাকে ভারি মস্ত লোক জ্ঞান করেন; সকল কথা যদিও স্পষ্ট বলিতে পারেন না, কিন্তু অত্যন্ত

জোরের সহিত বলিয়া থাকেন। রাজাকে প্রায় তিনি 'পুতুল দেবো' বলিয়া পরম প্রলোভন ও সান্ত্বনা দিয়া থাকেন, এবং রাজা যদি কোনো-প্রকার দুষ্টুমির লক্ষণ প্রকাশ করেন তবে ধ্রুব তাকে 'ঘরে বন্দ করে রাখব' বলিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত করিয়া তুলেন। এইরূপে রাজা এখন বিশেষ শাসনে আছেন— ধ্রুবের অনভিমত কোনো কাজ করিতে তিনি বড়ো একটা ভরসা করেন না।

ইতিমধ্যে হঠাৎ ধ্রুবের একটি সঙ্গী জুটিয়া গেল। একটি প্রতিবেশীর মেয়ে, ধ্রুব অপেক্ষা ছয়মাসের ছোটো। মিনিট দশেকের ভিতরে উভয়ের মধ্যে চিরস্থায়ী ভাব হইয়া গেল। মাঝে একটুখানি মনান্তর হইবারও সম্ভাবনা হইয়াছিল। ধ্রুবের হাতে একটা বড়ো বাতাসা ছিল। প্রথম প্রণয়ের উচ্ছ্বাসে ধ্রুব তাহার দুইটি ছোটো আঙুল দিয়া অতি সাবধানে ক্ষুদ্র একটু কণা ভাঙিয়া একেবারে তাহার সঙ্গিনীর মুখে পূরিয়া দিল ও পরম অনুগ্রহের সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "তুমি কাও।" সঙ্গিনী মিষ্ট পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়া কহিল, "আরো কাব।"

তখন ধ্রুব কিছু কাতর হইয়া পড়িল। বন্ধুত্বের উপরে এত অধিক দাবি ন্যায়সংগত বোধ হইল না; ধ্রুব তাহার স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য ও গৌরবের সহিত ঘাড় নাড়িয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "ছি— আর কেতে নেই— অছুক কোবে, বাবা মা'বে।" বলিয়াই অধিক বিলম্ব না করিয়া সমস্ত বাতাসাটা নিজের মুখের মধ্যে একেবারে পূরিয়া দিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। সহসা বালিকার মুখের মাংসপেশীর মধ্যে পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল; ওষ্ঠাধর ফুলিতে লাগিল, ভ্রূযুগ উপরে উঠিতে লাগিল, আসন্ন ক্রন্দনের সমস্ত লক্ষণ ব্যক্ত হইল।

ধ্রুব কাহারও ক্রন্দন সহিতে পারিত না, তাড়াতাড়ি সুগভীর সান্ত্বনার স্বরে কহিল, "কাল দেবো।"

রাজা আসিবা মাত্র ধ্রুব অত্যন্ত বিজ্ঞ হইয়া নূতন সঙ্গিনীর প্রতি

নির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "একে কিছু বোলো না, এ কাঁদবে। ছি, মারতে নেই, ছি!"

রাজার কোনোপ্রকার দুরভিসন্ধি ছিল না সত্য, তথাপি গায়ে পড়িয়া রাজাকে সাবধান করিয়া দেওয়া ধ্রুব অত্যন্ত আবশ্যক বিবেচনা করিল। রাজা মেয়েটিকে মারিলেন না, ধ্রুব স্পষ্টই দেখিল, তাহার উপদেশ নিষ্ফল নহে।

তার পরে ধ্রুব মুরুব্বির ভাব ধারণ করিয়া কোনো প্রকার বিপদের আশঙ্কা নাই জানাইয়া মেয়েটিকে পরম গাম্ভীর্যের সহিত আশ্বাস দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

তাহারও কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না। কারণ, মেয়েটি আপনা হইতে নির্ভীকভাবে রাজার কাছে গিয়া অত্যন্ত কৌতূহল ও লোভের সহিত তাঁহার হাতের কঙ্কণ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

এইরূপে ধ্রুব কেবলমাত্র নিজের যত্নে ও পরিশ্রমে পৃথিবীতে শান্তি ও প্রেম স্থাপন করিয়া প্রসন্নচিত্তে রাজার মুখের কাছে আপনার বেলফুলের মতো মোটা গোল কোমল পবিত্র মুখখানি বাড়াইয়া দিল— রাজার সদ্‌ব্যবহারের পুরস্কার; রাজা চুম্বন করিলেন।

তখন ধ্রুব তাহার সঙ্গিনীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া রাজাকে অনুমতি ও অনুরোধের মাঝামাঝি স্বরে কহিল, "একে চুমো কাও।"

রাজা ধ্রুবের আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহস করিলেন না। মেয়েটি তখন নিমন্ত্রণের কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া নিতান্ত অভ্যস্তভাবে অম্লানবদনে রাজার কোলের উপরে চড়িয়া বসিল।

এতক্ষণ জগতে কোনোপ্রকার অশান্তি বা উচ্ছৃঙ্খলতার লক্ষণ ছিল না, কিন্তু এইবার ধ্রুবের সিংহাসনে টান পড়িতেই তাহার সার্বভৌমিক প্রেম টলমল করিয়া উঠিল। রাজার কোলের 'পরে তাহার নিজের একমাত্র স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা বলবতী হইয়া উঠিল। মুখ অত্যন্ত ভার হইল,

মেয়েটিকে দুই-একবার টানিল, এমন-কি নিজের পক্ষে অবস্থা-বিশেষে ছোটো মেয়েকে মারাও ততটা অন্যায় বোধ হইল না।

রাজা তখন মিটমাট করিবার উদ্দেশ্যে ধ্রুবকেও তাঁহার আধখানা কোলে টানিয়া লইলেন। কিন্তু তাহাতেও ধ্রুবের আপত্তি দূর হইল না। অপরার্ধ অধিকার করিবার জন্য নূতন আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিল। এমন সময়ে নূতন রাজপুরোহিত বিল্বন ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন।

রাজা উভয়কেই কোল হইতে নামাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ধ্রুবকে বলিলেন, "ঠাকুরকে প্রণাম করো।" ধ্রুব তাহা আবশ্যক বোধ করিল না— মুখে আঙুল পুরিয়া বিদ্রোহীভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েটি আপনা হইতেই রাজার দেখাদেখি পুরোহিতকে প্রণাম করিল।

বিল্বন ঠাকুর ধ্রুবকে কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এ সঙ্গী জুটিল কোথা হইতে?"

ধ্রুব খানিকক্ষণ ভাবিয়া কহিল, "আমি টক্‌টক্ চ'ব।" টক্‌টক্ অর্থে ঘোড়া।

পুরোহিত কহিলেন, "বাহবা, প্রশ্ন এবং উত্তরের কী সামঞ্জস্য!"

সহসা মেয়েটির দিকে ধ্রুবের চক্ষু পড়িল, তাহার সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আপনার মত ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিল, "ও দুষ্টু, ওকে মা'ব।" বলিয়া আকাশে আপনার ক্ষুদ্র মুষ্টি নিক্ষেপ করিল।

রাজা গম্ভীরভাবে কহিলেন, "ছি, ধ্রুব।"

একটি ফুঁয়ে যেমন প্রদীপ নিবিয়া যায় তেমনি তৎক্ষণাৎ ধ্রুবের মুখ ম্লান হইয়া গেল। প্রথমে সে অশ্রু-নিবারণের জন্য দুই মুষ্টি দিয়া দুই চক্ষু রগড়াইতে লাগিল, অবশেষে দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র স্ফীত হৃদয় আর ধারণ করিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল।

বিল্বনঠাকুর তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া, কোলে লইয়া, আকাশে তুলিয়া, ভূমিতে নামাইয়া, অস্থির করিয়া তুলিলেন ; উচ্চৈঃস্বরে ও দ্রুত উচ্চারণে বলিলেন, "শোনো শোনো ধ্রুব, শোনো, তোমাকে শ্লোক বলি শোনো—

কলহ কটকটাং কাঠ কাঠিন্য কাঠ্যং

কটন কিটন কীটং কুট্‌নলং খট্টমট্টং

অর্থাৎ কিনা, যেছেলে কাঁদে তাকে কলহ কটকটাঙের মধ্যে পূরে খুব করে কাঠ কাঠিন্য কাঠ্যং দিতে হয়, তার পরে এতগুলো কটন কিটন কীটং নিয়ে একেবারে তিন দিন ধরে কুট্‌নলং খট্টমট্টং।"

পুরোহিত ঠাকুর এইরূপ অনর্গল বকিয়া গেলেন। ধ্রুবের ক্রন্দন অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল। সে প্রথমে গোলমালে বিব্রত ও অবাক হইয়া বিল্বন ঠাকুরের মুখের দিকে সজল চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া রহিল। তার পরে তাঁর হাতমুখ-নাড়া দেখিয়া তাহার অত্যন্ত কৌতুক বোধ হইল।

সে ভারি খুশি হইয়া বলিল, "আবার বলো।"

পুরোহিত আবার বকিয়া গেলেন। ধ্রুব অত্যন্ত হাসিতে হাসিতে বলিল, "আবার বলো।"

রাজা ধ্রুবের অশ্রুসিক্ত কপোলে এবং হাসিভরা অধরে বারবার চুম্বন করিলেন। তখন রাজা রাজপুরোহিত ও দুটি ছেলেমেয়ে মিলিয়া খেলা পড়িয়া গেল।

বিল্বন ঠাকুর রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ ইহাদের লইয়া বেশ আছেন। দিনরাত প্রখরবুদ্ধিমানদের সঙ্গে থাকিলে বুদ্ধি লোপ পায়। ছুরিতে অবিশ্রাম শান পড়িলে ছুরি ক্রমেই সূক্ষ্ম হইয়া অন্তর্ধান করে, একটা মোটা বাঁট কেবল অবশিষ্ট থাকে।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "এখনো তবে বোধ করি আমার সূক্ষ্ম বুদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই?"

বিল্বন। না। সূক্ষ্ম বুদ্ধির একটা লক্ষণ এই যে, তাহা সহজ জিনিসকে শক্ত করিয়া তুলে। পৃথিবীতে বিস্তর বুদ্ধিমান না থাকিলে পৃথিবীর কাজ অনেকটা সোজা হইত। নানারূপ সুবিধা করিতে গিয়াই নানারূপ অসুবিধা ঘটে। অধিক বুদ্ধি লইয়া মানুষ কী করিবে ভাবিয়া পায় না।

রাজা কহিলেন, "পাঁচটা আঙুলেই বেশ কাজ চলিয়া যায়; দুর্ভাগ্যক্রমে সাতটা আঙুল পাইলে ইচ্ছা করিয়া কাজ বাড়াইতে হয়।"

রাজা ধ্রুবকে ডাকিলেন। ধ্রুব তাহার সঙ্গিনীর সহিত পুনরায় শান্তি স্থাপন করিয়া খেলা করিতেছিল। রাজার ডাক শুনিয়া তৎক্ষণাৎ খেলা ছাড়িয়া রাজার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজা তাহাকে সম্মুখে বসাইয়া কহিলেন, "ধ্রুব, সেই নূতন গানটি ঠাকুরকে শোনাও।" কিন্তু ধ্রুব নিতান্ত আপত্তির ভাবে ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিল।

রাজা লোভ দেখাইয়া বলিলেন, "তোমাকে টকৃটক্ চড়তে দেব।"

ধ্রুব তাহার আধো-আধো উচ্চারণে বলিতে লাগিল—

আমায় ছ-জনায় মিলে পথ দেখায় ব'লে
পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানা কথার ছলে নানান মুনি বলে,
সংশয়ে তাই দুলি হে।
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ—
শত লোকের শত বুলি হে।
কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি
আড়াল ক'রে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,

ধরণীর ধুলো তাই নিয়ে আছি—
পাই যে চরণধূলি হে।
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়,
আপনা-আপনি বিবাদ বাধায়,
কারে সামালিব এ কী হল দায়—
একা যে অনেকগুলি হে।
আমায় এক করো তোমার প্রেমে বেঁধে
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে,
ধাঁধার মাঝে প'ড়ে কত মরি কেঁদে—
চরণেতে লহো তুলি হে।

ধ্রুবের মুখে আধো-আধো স্বরে এই কবিতা শুনিয়া বিল্বন ঠাকুর নিতান্ত বিগলিত হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "আশীর্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হইয়া থাকো।" ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া ঠাকুর অনেক মিনতি করিয়া বলিলেন, "আর-একবার শুনাও।"

ধ্রুব সুদৃঢ় মৌন আপত্তি প্রকাশ করিল। পুরোহিত চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া কহিলেন, "তবে আমি কাঁদি?"

ধ্রুব ঈষৎ বিচলিত হইয়া কহিল, "কাল শোনাব, ছি, কাঁদতে নেই, তুমি একন বায়ি (বাড়ি) যাও। বাবা মা'বে।"

বিল্বন হাসিয়া কহিলেন, "মধুর গলাধাক্কা।" রাজার নিকটে বিদায় লইয়া পুরোহিত-ঠাকুর পথে বাহির হইলেন।

পথে দুইজন পথিক যাইতেছিল। একজন আর-একজনকে কহিতেছিল, "তিন দিন তার দরজায় মাথা ভেঙে মলুম, এক পয়সা বের করতে পারলুম না— এইবার সে পথে বেরোলে তার মাথা ভাঙব, দেখি তাতে কী হয়।"

পিছন হইতে বিল্বন কহিলেন, "তাতেও কোনো ফল হবে না।

দেখতেই তো পাচ্ছ বাপু, মাথার মধ্যে কিছুই থাকে না, কেবল দুর্বুদ্ধি আছে। বরঞ্চ নিজের মাথা ভাঙা ভালো, কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না।"

পথিকদ্বয় শশব্যস্ত ও অপ্রতিভ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিল। বিল্বন কহিলেন, "বাপু, তোমরা যে কথা বলছিলে সে কথাগুলো ভালো নয়।"

পথিকদ্বয় কহিল, "যে আজ্ঞে ঠাকুর, আর এমন কথা বলব না।"

পুরোহিত-ঠাকুরকে পথে ছেলেরা ঘিরিল। তিনি কহিলেন, "আজ বিকালে আমার ওখানে যাস, আমি গল্প শোনাব।" আনন্দে ছেলেরা লাফালাফি চেঁচামেচি বাধাইয়া দিল। বিল্বন ঠাকুর এক-এক দিন অপরাহ্নে রাজ্যের ছেলে জড়ো করিয়া তাহাদিগকে সহজ ভাষায় রামায়ণ মহাভারত ও পৌরাণিক গল্প শুনাইতেন। মাঝে মাঝে দুই-একটি নীরস কথাও যথাসাধ্য রসসিক্ত করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু যখন দেখিতেন ছেলেদের মধ্যে হাই তোলা সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে তখন তাহাদের মন্দিরের বাগানের মধ্যে ছাড়িয়া দিতেন। সেখানে ফলের গাছ অসংখ্য আছে। ছেলেগুলো আকাশভেদী চীৎকার-শব্দে বানরের মতো ডালে ডালে লুটপাট বাধাইয়া দিত— বিল্বন আমোদ দেখিতেন।

বিল্বন কোন্ দেশী লোক কেহ জানে না। ব্রাহ্মণ, কিন্তু উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন। বলিদান প্রভৃতি বন্ধ করিয়া একপ্রকার নূতন অনুষ্ঠানে দেবীপূজা করিয়া থাকেন— প্রথম প্রথম তাহাতে লোকেরা সন্দেহ ও আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু এখন সমস্ত সহিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ বিল্বনের কথায় সকলে বশ। বিল্বন সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়া সকলের সঙ্গে আলাপ করেন, সকলের সংবাদ লন, এবং রোগীকে যাহা ঔষধ দেন তাহা আশ্চর্য খাটিয়া যায়। বিপদে আপদে সকলেই তাঁহার

পরামর্শ-মতে কাজ করে— তিনি মধ্যবর্তী হইয়া কাহারও বিবাদ মিটাইয়া দিলে বা কিছুর মীমাংসা করিয়া দিলে তাহার উপরে আর কেহ কথা কহিতে পারে না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এই বৎসরে ত্রিপুরায় এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিল। উত্তর হইতে সহসা পালে পালে ইঁদুর ত্রিপুরার শস্যক্ষেত্রে আসিয়া পড়িল। শস্য সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিল, এমন-কি কৃষকের ঘরে শস্য যত-কিছু সঞ্চিত ছিল তাহাও অধিকাংশই খাইয়া ফেলিল— রাজ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বন হইতে ফলমূল আহরণ করিয়া লোকে প্রাণধারণ করিতে লাগিল। বনের অভাব নাই, এবং বনে নানাপ্রকার আহার্য উদ্ভিজ্জও আছে। মৃগয়ালব্ধ মাংস বাজারে মহার্ঘ মূল্যে বিক্রয় হইতে লাগিল। লোকে বুনো মহিষ, হরিণ, খরগোশ, সজারু, কাঠবিড়ালি, বরা, বড়ো বড়ো স্থলকচ্ছপ শিকার করিয়া খাইতে লাগিল। হাতি পাইলে হাতিও খায়। অজগর সাপ খাইতে লাগিল। বনে আহার্য পাখির অভাব নাই; গাছের কোটরের মধ্যে মৌচাক ও মধু পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে নদীর জল বাঁধিয়া তাহাতে মাদক লতা ফেলিয়া দিলে মাছেরা অবশ হইয়া ভাসিয়া উঠে; সেই-সকল মাছ ধরিয়া লোকেরা খাইতে লাগিল এবং শুকাইয়া সঞ্চয় করিল। আহার এখনো কোনোক্রমে চলিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। স্থানে স্থানে চুরি-ডাকাতি আরম্ভ হইল; প্রজারা বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ করিল।

তাহারা বলিতে লাগিল, মায়ের বলি বন্ধ করাতে মায়ের অভিশাপে এই-সকল দুর্ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিল্বন ঠাকুর সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি উপহাসচ্ছলে কহিলেন, কৈলাসে

কার্তিক-গণেশের মধ্যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, কার্তিকের ময়ূরের নামে গণেশের ইঁদুরগুলো ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরীর কাছে নালিশ করিতে আসিয়াছে। প্রজারা এ কথা নিতান্ত উপহাসের ভাবে গ্রহণ করিল না। তাহারা দেখিল, বিল্বন ঠাকুরের কথামত ইঁদুরের স্রোত যেমন দ্রুতবেগে আসিল তেমনি দ্রুতবেগে সমস্ত শস্য নষ্ট করিয়া কোথায় অন্তর্ধান করিল— তিন দিনের মধ্যে তাহাদের আর চিহ্নমাত্র রহিল না। বিল্বন ঠাকুরের অগাধ জ্ঞানের সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না। কৈলাসে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ সম্বন্ধে গান রচিত হইতে লাগিল; মেয়েরা ছেলেরা ভিক্ষুকেরা সেই গান গাহিতে লাগিল, পথে ঘাটে সেই গান প্রচলিত হইল।

কিন্তু রাজার প্রতি বিদ্বেষভাব ভালো করিয়া ঘুচিল না। বিল্বন ঠাকুরের পরামর্শ-মতে গোবিন্দমাণিক্য দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজাদের এক বৎসরের খাজনা মাপ করিলেন। তাহার কতকটা ফল হইল। কিন্তু তবুও অনেকে মায়ের অভিশাপ এড়াইবার জন্য চট্টগ্রামে পার্বত্য প্রদেশে পলায়ন করিল। এমন-কি রাজার মনে সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল।

তিনি বিল্বনকে ডাকিয়া কহিলেন, "ঠাকুর, রাজার পাপেই প্রজা কষ্ট পায়। আমি কি মায়ের বলি বন্ধ করিয়া পাপ করিয়াছি? তাহারই কি এ শাস্তি?"

বিল্বন সমস্ত কথা একেবারে উড়াইয়া দিলেন। তিনি কহিলেন, "মায়ের কাছে যখন হাজার নরবলি হইত তখন আপনার অধিক প্রজাহানি হইয়াছে, না এই দুর্ভিক্ষে হইয়াছে?"

রাজা নিরুত্তর হইয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার মনের মধ্য হইতে সংশয় সম্পূর্ণ দূর হইল না। প্রজারা তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছে, তাঁহার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে, ইহাতে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে, তাঁহার নিজের প্রতিও নিজের সন্দেহ জন্মিয়াছে। তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "কিছুই বুঝিতে পারি না।"

বিল্বন কহিলেন, "অধিক বুঝিবার আবশ্যক কী! কেন কতকগুলো ইঁদুর আসিয়া শস্য খাইয়া গেল তাহা না'ই বুঝিলাম। আমি অন্যায় করিব না, আমি সকলের হিত করিব, এইটুকু স্পষ্ট বুঝিলেই হইল। তার পরে বিধাতার কাজ বিধাতা করিবেন, তিনি আমাদের হিসাব দিতে আসিবেন না।"

রাজা কহিলেন, "ঠাকুর, তুমি গৃহে গৃহে ফিরিয়া অবিশ্রাম কাজ করিতেছ, পৃথিবীর যতটুকু হিত করিতেছ ততটুকুই তোমার পুরস্কার হইতেছে—এই আনন্দে তোমার সমস্ত সংশয় চলিয়া যায়। আমি কেবল দিনরাত্রি একটা মুকুট মাথায় করিয়া সিংহাসনের উপরে চড়িয়া বসিয়া আছি, কেবল কতকগুলো চিন্তা ঘাড়ে করিয়া আছি—তোমার কাজ দেখিলে আমার লোভ হয়।"

বিল্বন কহিলেন, "মহারাজ, আমি তোমারই তো এক অংশ; তুমি ঐ সিংহাসনে বসিয়া না থাকিলে আমি কি কাজ করিতে পারিতাম? তোমাতে আমাতে মিলিয়া আমরা উভয়ে সম্পূর্ণ হইয়াছি।"

এই বলিয়া বিল্বন বিদায় গ্রহণ করিলেন, রাজা মুকুট মাথায় করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। মনে মনে কহিলেন, 'আমার কাজ যথেষ্ট রহিয়াছে, আমি তাহার কিছুই করি না। আমি কেবল আমার চিন্তা লইয়াই নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। সেইজন্যই আমি প্রজাদের বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারি না। রাজ্যশাসনের আমি যোগ্য নই।'

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মোগল-সৈন্যের কর্তা হইয়া নক্ষত্ররায় পথের মধ্যে তেঁতুলে-নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রভাতে রঘুপতি আসিয়া কহিলেন, "যাত্রা করিতে হইবে, মহারাজ প্রস্তুত হোন।"

সহসা রঘুপতির মুখে মহারাজ শব্দ অত্যন্ত মিষ্ট শুনাইল। নক্ষত্ররায়

উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। তিনি কল্পনায় পৃথিবীসুদ্ধ লোকের মুখ হইতে মহারাজ সম্ভাষণ শুনিতে লাগিলেন-- তিনি মনে মনে ত্রিপুরার উচ্চ সিংহাসনে চড়িয়া সভা উজ্জ্বল করিয়া বসিলেন। মনের আনন্দে বলিলেন, "ঠাকুর, আপনাকে কখনোই ছাড়া হইবে না। আপনাকে সভায় থাকিতে হইবে। আপনি কী চান সেইটে আমাকে বলুন।"

নক্ষত্ররায় মনে মনে রঘুপতিকে তৎক্ষণাৎ বৃহৎ এক খণ্ড জায়গির অবলীলাক্রমে দান করিয়া ফেলিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "আমি কিছু চাহি না।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "সে কী কথা! তা হইবে না ঠাকুর। কিছু লইতেই হইবে। কয়লাসর পরগনা আমি আপনাকে দিলাম, আপনি লেখাপড়া করিয়া লউন।"

রঘুপতি কহিলেন, "সে-সকল পরে দেখা যাইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "পরে কেন, আমি এখনি দিব। সমস্ত কয়লাসর পরগনা আপনারই হইল, আমি এক পয়সা খাজনা লইব না।" বলিয়া নক্ষত্ররায় মাথা তুলিয়া অত্যন্ত সিধা হইয়া বসিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "মরিবার জন্য তিন হাত জমি মিলিলেই সুখী হইব। আমি আর কিছু চাহি না।" বলিয়া রঘুপতি চলিয়া গেলেন। তাঁহার জয়সিংহকে মনে পড়িয়াছে। জয়সিংহ যদি থাকিত তবে পুরস্কারের স্বরূপ কিছু লইতেন; জয়সিংহ যখন নাই তখন সমস্ত ত্রিপুরারাজ্য মৃত্তিকার সমষ্টি ছাড়া আর কিছু মনে হইল না।

রঘুপতি এখন নক্ষত্ররায়কে রাজাভিমানে মত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার মনের মধ্যে ভয় আছে, পাছে এত আয়োজন করিয়া সমস্ত ব্যর্থ হয়, পাছে দুর্বলস্বভাব নক্ষত্ররায় ত্রিপুরায় গিয়া বিনাযুদ্ধে রাজার নিকট ধরা দেন। কিন্তু দুর্বল হৃদয়ে একবার রাজ্যমদ জন্মিলে আর ভাবনা নাই। রঘুপতি নক্ষত্ররায়ের প্রতি আর অবজ্ঞা

প্রদর্শন করেন না, কথায় কথায় তাঁহার সম্মান দেখাইয়া থাকেন। সকল বিষয়ে তাঁহার মৌখিক আদেশ লইয়া থাকেন। মোগল-সৈন্যেরা তাঁহাকে মহারাজা-সাহেব বলে, তাঁহাকে দেখিলে শশব্যস্ত হইয়া উঠে— বায়ু বহিলে যেমন সমস্ত শস্যক্ষেত্র নত হইয়া যায় তেমনি নক্ষত্ররায় আসিয়া দাঁড়াইলে সারি সারি মোগল-সেনা একসঙ্গে মাথা নত করিয়া সেলাম করে। সেনাপতি সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করেন। শত শত মুক্ত তরবারির জ্যোতির মধ্যে বৃহৎ হস্তীর পৃষ্ঠে রাজচিহ্ন-অঙ্কিত স্বর্ণমণ্ডিত হাওদায় চড়িয়া তিনি যাত্রা করেন; সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসজনক বাদ্য বাজিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে নিশানধারী রাজনিশান ধরিয়া চলে। তিনি যেখান দিয়া যান সেখানকার গ্রামের লোক সৈন্যের ভয়ে ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়া যায়। তাহাদের ত্রাস দেখিয়া নক্ষত্ররায়ের মনে গর্বের উদয় হয়। তাঁহার মনে হয়, 'আমি দিগ্বিজয় করিয়া চলিয়াছি।' ছোটো ছোটো জমিদারগণ নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া আসিয়া তাঁহাকে সেলাম করিয়া যায়; তাহাদিগকে পরাজিত নৃপতি বলিয়া বোধ হয়, মহাভারতের দিগ্বিজয়ী পাণ্ডবদের কথা মনে পড়ে।

একদিন সৈন্যেরা আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল, "মহারাজা-সাহেব!" নক্ষত্ররায় খাড়া হইয়া বসিলেন।

"আমরা মহারাজের জন্য জান দিতে আসিয়াছি, আমরা জানের পরোয়া রাখি না। বরাবর আমাদের দস্তুর আছে— লড়াইয়ে যাইবার পথে আমরা গ্রাম লুঠ করিয়া যাই, কোনো শাস্ত্রে ইহাতে দোষ লিখে না।"

নক্ষত্ররায় মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "ঠিক কথা, ঠিক কথা।"

সৈন্যেরা কহিল, "ব্রাহ্মণঠাকুর আমাদের লুঠ করিতে বারণ করিয়াছেন। আমরা জান দিতে যাইতেছি, অথচ একটু লুঠ করিতে পারিব না, এ বড়ো অবিচার।"

নক্ষত্ররায় পুনশ্চ মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "ঠিক কথা, ঠিক কথা।"

"মহারাজার যদি হুকুম মিলে তো আমরা ব্রাহ্মণঠাকুরের কথা না মানিয়া লুঠ করিতে যাই।"

নক্ষত্ররায় অত্যন্ত স্পর্ধার সহিত কহিলেন, "ব্রাহ্মণঠাকুর কে? ব্রাহ্মণঠাকুর কী জানে? আমি তোমাদিগকে হুকুম দিতেছি, তোমরা লুঠপাট করিতে যাও।" বলিয়া একবার ইতস্তত চাহিয়া দেখিলেন— কোথাও রঘুপতিকে না দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

কিন্তু রঘুপতিকে এইরূপে অকাতরে লঙ্ঘন করিয়া তিনি মনের মধ্যে অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন। ক্ষমতামদ মদিরার মতো তাঁহার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইতে লাগিল। পৃথিবীকে নূতন চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। কাল্পনিক বেলুনের উপর চড়িয়া পৃথিবীটা যেন অনেক নিম্নে মেঘের মতো মিলাইয়া গেল। এমন-কি, মাঝে মাঝে কদাচ কখনো রঘুপতিকেও নগণ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সহসা বলপূর্বক গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। মনে মনে বার বার করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমাকে নির্বাসন! একটা সামান্য প্রজার মতো আমাকে বিচারসভায় আহ্বান! এবার দেখি কে কাহাকে নির্বাসিত করে! এবার ত্রিপুরাসুদ্ধ লোক নক্ষত্ররায়ের প্রতাপ অবগত হইবে।' নক্ষত্ররায় ভারি উৎফুল্ল ও স্ফীত হইলেন।

নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর অনর্থক উৎপীড়ন ও লুঠপাটের প্রতি রঘুপতির বিশেষ বিরাগ ছিল। নিবারণ করিবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সৈন্যেরা নক্ষত্ররায়ের আজ্ঞা পাইয়া তাঁহাকে অবহেলা করিল। তিনি নক্ষত্ররায়ের কাছে আসিয়া বলিলেন, "অসহায় গ্রামবাসীদের উপরে কেন এ অত্যাচার?"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "ঠাকুর, এ-সব বিষয়ে তুমি ভালো বোঝ না। যুদ্ধবিগ্রহের সময় সৈন্যদের লুঠপাটে নিষেধ করিয়া নিরুৎসাহ করা ভালো না।"

নক্ষত্ররায়ের কথা শুনিয়া রঘুপতি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। সহসা নক্ষত্ররায়ের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান দেখিয়া তিনি মনে মনে হাসিলেন। কহিলেন, "এখন লুঠপাট করিতে দিলে পরে ইহাদিগকে সামলানো দায় হইবে। সমস্ত ত্রিপুরা লুঠিয়া লইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "তাহাতে হানি কী? আমি তো তাহাই চাই— ত্রিপুরা একবার বুঝুক, নক্ষত্ররায়কে নির্বাসিত করার ফল কী। ঠাকুর, এ-সব বিষয়ে তুমি কিছু বোঝ না, তুমি তো কখনো যুদ্ধ কর নাই।"

রঘুপতি মনে মনে অত্যন্ত আমোদ বোধ করিলেন। কিছু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন। নক্ষত্ররায় নিতান্ত পুত্তলিকার মতো না হইয়া একটু শক্ত মানুষের মতো হন, এই তাঁহার ইচ্ছা ছিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ত্রিপুরায় ইঁদুরের উৎপাত যখন আরম্ভ হয় তখন শ্রাবণ মাস। তখন ক্ষেত্রে কেবল ভুট্টা ফলিয়াছিল, এবং পাহাড়ে জমিতে ধান্যক্ষেত্রেও পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তিন মাস কোনোমতে কাটিয়া গেল— অগ্রহায়ণ মাসে নিম্নভূমিতে যখন ধান কাটিবার সময় আসিল তখন দেশে আনন্দ পড়িয়া গেল। চাষারা[১] স্ত্রীলোক বালক যুবক বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া দা হাতে লইয়া ক্ষেত্রে গিয়া পড়িল। হৈয়া হৈয়া শব্দে পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতে লাগিল; জুমিয়া রমণীদের গানে মাঠ বাট ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রাজার প্রতি অসন্তোষ দূর হইয়া গেল, রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। এমন সময় সংবাদ আসিল, নক্ষত্ররায় রাজ্য-আক্রমণের উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানায়

১ প্রকৃত পক্ষে ইহাদের চাষা বলা যায় না। কারণ, ইহারা রীতিমত চাষ করে না। জঙ্গল দগ্ধ করিয়া বর্ষারম্ভে বীজ বপন করে মাত্র। এইরূপ ক্ষেত্রকে জুম বলে, কৃষক-দিগকে জুমিয়া বলে।

আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং অত্যন্ত লুঠপাট উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন— এই সংবাদে সমস্ত রাজ্য শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

এ সংবাদ রাজার বক্ষে ছুরির মতো বিদ্ধ হইল। সমস্ত দিনই তাঁহাকে বিঁধিতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া কেবলই প্রত্যেক বার নূতন করিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, নক্ষত্ররায় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। নক্ষত্ররায়ের সরল সুন্দর মুখ শতবার তাঁহার স্নেহচক্ষের সম্মুখে দেখিতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গেই মনে হইতে লাগিল, সেই নক্ষত্ররায় কতকগুলো সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তলোয়ার হাতে লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এক-একবার তাঁহার মনে মনে ইচ্ছা করিতে লাগিল— একটি সৈন্যও না লইয়া নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে বৃহৎ রণক্ষেত্রে একা দাঁড়াইয়া সমস্ত বক্ষস্থল অবারিত করিয়া নক্ষত্ররায়ের সহস্র সৈনিকের তরবারি এককালে তাঁহার হৃদয়ে গ্রহণ করেন।

তিনি ধ্রুবকে কাছে টানিয়া বলিলেন, "ধ্রুব, তুইও কি এই মুকুটখানার জন্য আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে পারিস?" বলিয়া মুকুট ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন, একটি বড়ো মুক্তা ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল।

ধ্রুব আগ্রহের সহিত হাত বাড়াইয়া কহিল, "আমি নেব।"

রাজা ধ্রুবের মাথায় মুকুট পরাইয়া তাহাকে কোলে লইয়া কহিলেন, "এই লও, আমি কাহারও সহিত ঝগড়া করিতে চাহি না।" বলিয়া অত্যন্ত আবেগের সহিত ধ্রুবকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন।

তাহার পরে সমস্ত দিন ধরিয়া 'এ কেবল আমারই পাপের শাস্তি' বলিয়া রাজা নিজের সহিত তর্ক করিতে লাগিলেন। নহিলে ভাই কখনো ভাইকে আক্রমণ করে না। ইহা মনে করিয়া তাঁহার কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা হইল। তিনি মনে করিলেন, ইহা ঈশ্বরের বিধান। জগৎপতির দরবার হইতে আদেশ আসিয়াছে, ক্ষুদ্র নক্ষত্ররায় কেবল তাহার মানব-হৃদয়ের প্ররোচনায় তাহা লঙ্ঘন করিতে পারে না। এই মনে করিয়া

তাঁহার আহত স্নেহ কিছু শান্তি পাইল। পাপ তিনি নিজের স্কন্ধে লইতে রাজি আছেন; নক্ষত্ররায়ের পাপের ভার যেন তাহাতে কতকটা কমিয়া যায়।

বিল্বন আসিয়া কহিলেন, "মহারাজ, এ সময় কি আকাশের দিকে তাকাইয়া ভাবিবার সময়?"

রাজা কহিলেন, "ঠাকুর, এ-সকল আমারই পাপের ফল।"

বিল্বন কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ, এই-সকল কথায় আমার ধৈর্য থাকে না। দুঃখ যে পাপেরই ফল তাহা কে বলিল, পুণ্যের ফলও হইতে পারে। কত ধর্মাত্মা আজীবন দুঃখে কাটাইয়া গিয়াছেন।"

রাজা নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

বিল্বন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ কী পাপ করিয়াছিলেন যাহার ফলে এই ঘটনা ঘটিল।"

রাজা কহিলেন, "আপন ভাইকে নির্বাসিত করিয়াছিলাম।"

বিল্বন কহিলেন, "আপনি ভাইকে নির্বাসিত করেন নাই। দোষীকে নির্বাসিত করিয়াছেন।"

রাজা কহিলেন, "দোষী হইলেও ভাইকে নির্বাসনের পাপ আছেই। তাহার ফল হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। কৌরবেরা দুরাচার হইলেও পাণ্ডবেরা তাহাদিগকে বধ করিয়া প্রসন্নচিত্তে রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। যজ্ঞ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। পাণ্ডবেরা কৌরবদের নিকট হইতে রাজ্য লইলেন, কৌরবেরা মরিয়া গিয়া পাণ্ডবদের রাজ্য হরণ করিলেন। আমি নক্ষত্রকে নির্বাসিত করিয়াছি, নক্ষত্র আমাকে নির্বাসিত করিতে আসিতেছে।"

বিল্বন কহিলেন, "পাণ্ডবেরা পাপের শাস্তি দিবার জন্য কৌরবদের সহিত যুদ্ধ করেন নাই, তাঁহারা রাজ্যলাভের জন্য করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ পাপের শাস্তি দিয়া নিজের সুখদুঃখ উপেক্ষা করিয়া ধর্ম পালন

করিয়াছিলেন। ইহাতে আমি তো পাপ কিছুই দেখিতেছি না। তবে প্রায়শ্চিত্তের বিধি দিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আমি ব্রাহ্মণ উপস্থিত আছি, আমাকে সন্তুষ্ট করিলেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

রাজা ঈষৎ চুপ করিয়া রহিলেন।

বিল্বন কহিলেন, "সে যাহাই হউক, এখন যুদ্ধের আয়োজন করুন। আর বিলম্ব করিবেন না।"

রাজা কহিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না।"

বিল্বন কহিলেন, "সে হইতেই পারে না। আপনি বসিয়া বসিয়া ভাবুন। আমি ততক্ষণ সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টা করি গে। সকলেই এখন জুমে গিয়াছে, যথেষ্ট সৈন্য পাওয়া কঠিন।" বলিয়া আর কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বিল্বন চলিয়া গেলেন।

ধ্রুবের সহসা কী মনে হইল; সে রাজার কাছে আসিয়া রাজার মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকা কোথায়?" নক্ষত্ররায়কে ধ্রুব কাকা বলিত।

রাজা কহিলেন, "কাকা আসিতেছেন ধ্রুব।" তাঁহার চোখের পাতা ঈষৎ আর্দ্র হইয়া গেল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিল্বন ঠাকুরের বিস্তর কাজ পড়িয়া গেল। তিনি চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশে নানা উপহার-সমেত দ্রুতগামী দূত পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে কুকি-গ্রামপতিদের নিকটে কুকি-সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। যুদ্ধের নাম শুনিয়া তাহারা নাচিয়া উঠিল। কুকিদের যত লাল (গ্রামপতি) ছিল তাহারা যুদ্ধের সংবাদস্বরূপ লাল বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা দা দূতহস্তে গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে কুকির স্রোত চট্টগ্রামের শৈলশৃঙ্গ হইতে ত্রিপুরার শৈলশৃঙ্গে আসিয়া পড়িল।

তাহাদিগকে কোনো নিয়মের মধ্যে সংযত করিয়া রাখাই দায়। বিল্বন স্বয়ং ত্রিপুরার গ্রামে গ্রামে গিয়া জুম হইতে বাছিয়া বাছিয়া সাহসী যুবাপুরুষদিগকে সৈন্যশ্রেণীতে সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। অগ্রসর হইয়া মোগলসৈন্যদিগকে আক্রমণ করা বিল্বন ঠাকুর সংগত বিবেচনা করিলেন না। যখন তাহারা সমতলক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্গম শৈলশৃঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইবে তখন অরণ্য পর্বত ও নানা দুর্গম গুপ্ত স্থান হইতে তাহাদিগকে সহসা আক্রমণ করিয়া চকিত করিবেন স্থির করিলেন। বড়ো বড়ো শিলাখণ্ডের দ্বারা গোমতীনদীর জল বাঁধিয়া রাখিলেন— নিতান্ত পরাভবের আশঙ্কা দেখিলে সেই বাঁধ ভাঙিয়া দিয়া জলপ্লাবনের দ্বারা মোগল সৈন্যদিগকে ভাসাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

এ দিকে নক্ষত্ররায় দেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে ত্রিপুরার পার্বত্য প্রদেশে আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন জুম কাটা শেষ হইয়া গেছে। জুমিয়ারা সকলেই দা ও তীরধনু হাতে করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। কুকিদলকে উচ্ছ্বাসোন্মুখ জলপ্রপাতের মতো আর বাঁধিয়া রাখা যায় না।

গোবিন্দমাণিক্য বলিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না।"

বিল্বন ঠাকুর কহিলেন, "এ কোনো কাজের কথাই নহে।"

রাজা কহিলেন, "আমি রাজত্ব করিবার যোগ্য নহি, তাহারই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। সেই জন্য আমার প্রতি প্রজাদের বিশ্বাস নাই, সেই জন্যই দুর্ভিক্ষের সূচনা, সেই জন্যই এই যুদ্ধ। রাজ্য-পরিত্যাগের জন্য এ-সকল ভগবানের আদেশ।"

বিল্বন কহিলেন, "এ কখনোই ভগবানের আদেশ নহে। ঈশ্বর আপনার উপরে রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছেন; যতদিন রাজকার্য নিঃসংকট ছিল ততদিন আপনার সহজ কর্তব্য অনায়াসে পালন করিয়াছেন, যখনই রাজ্যভার গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে তখনই তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া

আপনি স্বাধীন হইতে চাহিতেছেন এবং ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া আপনাকে ফাঁকি দিয়া সুখী করিতে চাহিতেছেন।"

কথাটা গোবিন্দমাণিক্যের মনে লাগিল। তিনি নিরুত্তর হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন; অবশেষে নিতান্ত কাতর হইয়া বলিলেন, "মনে করো-না ঠাকুর, আমার পরাজয় হইয়াছে, নক্ষত্র আমাকে বধ করিয়া রাজা হইয়াছে।"

বিল্বন কহিলেন, "যদি সত্য তাহাই ঘটে তাহা হইলে আমি মহারাজের জন্য শোক করিব না। কিন্তু মহারাজ যদি কর্তব্যে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন তবেই আমাদের শোকের কারণ ঘটিবে।"

রাজা কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া কহিলেন, "আপন ভাইয়ের রক্তপাত করিব!"

বিল্বন কহিলেন, "কর্তব্যের কাছে ভাই বন্ধু কেহই নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কী উপদেশ দিয়াছিলেন স্মরণ করিয়া দেখুন!"

রাজা কহিলেন, "ঠাকুর, তুমি কি বল আমি স্বহস্তে এই তরবারি লইয়া নক্ষত্ররায়কে আঘাত করিব?"

বিল্বন কহিলেন, "হাঁ।"

সহসা ধ্রুব আসিয়া অত্যন্ত গম্ভীর গলায় কহিল, "ছি, ও কথা বলতে নেই।"

ধ্রুব খেলা করিতেছিল, দুই পক্ষের কী একটা গোলযোগ শুনিয়া সহসা তাহার মনে হইল, দুইজনে অবশ্যই একটা দুষ্টামি করিতেছে— অতএব সময় থাকিতে দুই জনকে কিঞ্চিৎ শাসন করিয়া আসা আবশ্যক। এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি হঠাৎ আসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "ছি, ও কথা বলতে নেই।"

পুরোহিত-ঠাকুরের অত্যন্ত আমোদ বোধ হইল। তিনি হাসিয়া উঠিলেন, ধ্রুবকে কোলে লইয়া চুমো খাইতে লাগিলেন। কিন্তু রাজা

হাসিলেন না। তাঁহার মনে হইল, যেন বালকের মুখে তিনি দৈববাণী শুনিলেন।

তিনি অসন্দিগ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুর, আমি স্থির করিয়াছি এ রক্তপাত আমি ঘটিতে দিব না, আমি যুদ্ধ করিব না।"

বিল্বন ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "মহারাজের যদি যুদ্ধ করিতেই আপত্তি থাকে তবে আর এক কাজ করুন। আপনি নক্ষত্ররায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে বিরত করুন।"

গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, "ইহাতে আমি সম্মত আছি।"

বিল্বন কহিলেন, "তবে সেইরূপ প্রস্তাব লিখিয়া নক্ষত্ররায়ের নিকট পাঠানো হউক।"

অবশেষে তাহাই স্থির হইল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্ররায় সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কোথাও তিলমাত্র বাধা পাইলেন না। ত্রিপুরার যে গ্রামেই তিনি পদার্পণ করিলেন সেই গ্রামেই তাঁহাকে রাজা বলিয়া বরণ করিতে লাগিল। পদে পদে রাজত্বের আস্বাদ পাইতে লাগিলেন, ক্ষুধা আরও বাড়িতে লাগিল; চারি দিকের বিস্তৃত ক্ষেত্র গ্রাম, পর্বতশ্রেণী, নদী, সমস্তই 'আমার' বলিয়া মনে হইতে লাগিল এবং সেই অধিকার-ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নিজেও যেন অনেক দূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া অত্যন্ত প্রশস্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। মোগলসৈন্যেরা যাহা চায় তিনি তাহাই তাহাদিগকে লইতে আলী-হুকুম দিয়া দিলেন। মনে হইল, 'এ-সমস্তই আমার এবং ইহারা আমারই রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা-দিগকে কোনো সুখ হইতে বঞ্চিত করা হইবে না;' স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া মোগলেরা তাঁহার আতিথ্যের ও রাজবৎ উদারতা ও বদান্যতার অনেক

প্রশংসা করিবে ; বলিবে, 'ত্রিপুরার রাজা বড়ো কম রাজা নহে।' মোগল সৈন্যদের নিকট হইতে খ্যাতি লাভ করিবার জন্য তিনি সততই উৎসুক হইয়া রহিলেন। তাহারা তাঁহাকে কোনোপ্রকার শ্রুতিমধুর সম্ভাষণ করিলে তিনি নিতান্ত জল হইয়া যান। সর্বদাই ভয় হয়, পাছে কোনো নিন্দার কারণ ঘটে।

রঘুপতি আসিয়া কহিলেন, "যুদ্ধের তো কোনো উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "না ঠাকুর, ভয় পাইয়াছে।" বলিয়া অত্যন্ত হাসিতে লাগিলেন।

রঘুপতি হাসিবার বিশেষ কোনো কারণ দেখিলেন না, কিন্তু তথাপি হাসিলেন।

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "নক্ষত্ররায় নবাবের সৈন্য লইয়া আসিয়াছে। বড়ো সহজ ব্যাপার নহে।"

রঘুপতি কহিলেন, "দেখি এবার কে কাহাকে নির্বাসনে পাঠায়। কেমন ?"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আমি ইচ্ছা করিলে নির্বাসন-দণ্ড দিতে পারি, কারারুদ্ধ করিতেও পারি— বধের হুকুম দিতেও পারি। এখনো স্থির করি নাই কোন্‌টা করিব।" বলিয়া অতিশয় বিজ্ঞভাবে অনেক বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "অত ভাবিবেন না মহারাজ! এখনো অনেক সময় আছে। কিন্তু আমার ভয় হইতেছে, গোবিন্দমাণিক্য যুদ্ধ না করিয়াই আপনাকে পরাভূত করিবেন।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "সে কেমন করিয়া হইবে ?"

রঘুপতি কহিলেন, "গোবিন্দমাণিক্য সৈন্যগুলোকে আড়ালে রাখিয়া বিস্তর ভ্রাতৃস্নেহ দেখাইবেন। গলা ধরিয়া বলিবেন, 'ছোটোভাই আমার,

এসো, ঘরে এসো, দুধ-সর খাওসে।' মহারাজ কাঁদিয়া বলিবেন, 'যে আজ্ঞে, আমি এখনই যাইতেছি। অধিক বিলম্ব হইবে না।' বলিয়া নাগরা জুতোজোড়াটা পায়ে দিয়া দাদার পিছনে পিছনে মাথা নিচু করিয়া টাট্টু ঘোড়াটির মতো চলিবেন। বাদশাহের মোগল ফৌজ তামাশা দেখিয়া হাসিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইবে।"

নক্ষত্ররায় রঘুপতির মুখে এই তীব্র বিদ্রূপ শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। কিঞ্চিৎ হাসিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "আমাকে কি ছেলেমানুষ পাইয়াছে যে এমনি করিয়া ভুলাইবে! তাহার জো নাই। সে হবে না ঠাকুর! দেখিয়া লইয়ো।"

সেই দিন গোবিন্দমাণিক্যের চিঠি আসিয়া পৌঁছিল। সে চিঠি রঘুপতি খুলিলেন। রাজা অত্যন্ত স্নেহ প্রকাশ করিয়া সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছেন। চিঠি নক্ষত্ররায়কে দেখাইলেন না। দূতকে বলিয়া দিলেন, 'কষ্ট স্বীকার করিয়া গোবিন্দমাণিক্যের এতদূর আসিবার দরকার নাই। সৈন্য ও তরবারি লইয়া মহারাজ নক্ষত্রমাণিক্য শীঘ্রই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। গোবিন্দমাণিক্য এই অল্পকাল যেন প্রিয়ভ্রাতৃবিরহে অধিক কাতর হইয়া না পড়েন। আট বৎসর নির্বাসনে থাকিলে ইহা অপেক্ষা আরও অধিক কাল বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ছিল।'

রঘুপতি নক্ষত্ররায়কে গিয়া কহিলেন, "গোবিন্দমাণিক্য নির্বাসিত ছোটো ভাইকে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ একখানি চিঠি লিখিয়াছেন।"

নক্ষত্ররায় পরম উপেক্ষার ভাণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "সত্য না কি? কী চিঠি? কই দেখি।" বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "সে চিঠি মহারাজকে দেখানো আমি আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। তখনই ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। বলিয়াছি, যুদ্ধ ছাড়া ইহার আর কোনো উত্তর নাই।"

নক্ষত্ররায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেশ করিয়াছ ঠাকুর! তুমি

বলিয়াছ যুদ্ধ ছাড়া ইহার আর-কোনো উত্তর নাই? বেশ উত্তর দিয়াছ।"

রঘুপতি কহিলেন, "গোবিন্দমাণিক্য উত্তর শুনিয়া ভাবিবে যে, যখন নির্বাসন দিয়াছিলাম তখন তো ভাই বেশ সহজে গিয়াছিল, কিন্তু সেই ভাই ঘরে ফিরিয়া আসিবার সময় তো কম গোলযোগ করিতেছে না!"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "মনে করিবেন, ভাইটি বড়ো সহজ লোক নয়। মনে করিলেই যে যখন ইচ্ছা নির্বাসন দিব এবং যখন ইচ্ছা ডাকিয়া লইব, সেটি হইবার জো নাই।" বলিয়া অত্যন্ত আনন্দে দ্বিতীয়বার হাসিতে লাগিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্ররায়ের উত্তর শুনিয়া গোবিন্দমাণিক্য অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। বিল্বন মনে করিলেন, এবারে হয়তো মহারাজা আপত্তি প্রকাশ করিবেন না। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য বলিলেন, "এ কথা কখনোই নক্ষত্ররায়ের কথা নহে। এ সেই পুরোহিত বলিয়া পাঠাইয়াছে। নক্ষত্রের মুখ দিয়া এমন কথা কখনোই বাহির হইতে পারে না।"

বিল্বন কহিলেন, "মহারাজ এক্ষণে কী উপায় স্থির করিলেন?"

রাজা কহিলেন, "আমি নক্ষত্রের সঙ্গে কোনোক্রমে একবার দেখা করিতে পাই, তাহা হইলে সমস্ত মিটমাট করিয়া দিতে পারি।"

বিল্বন কহিলেন, "আর দেখা যদি না হয়?"

রাজা। তাহা হইলে আমি রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইব।

বিল্বন কহিলেন, "আচ্ছা, আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

পাহাড়ের উপর নক্ষত্ররায়ের শিবির। ঘন জঙ্গল। বাঁশবন, বেতবন, খাগড়ার বন। নানাবিধ লতাগুল্মে ভূমি আচ্ছন্ন। সৈন্যেরা বন্য হস্তীদের চলিবার পথ অনুসরণ করিয়া শিখরে উঠিয়াছে। তখন

অপরাহ্ণ। সূর্য পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে হেলিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব প্রান্তে অন্ধকার করিয়াছে। গোধূলির ছায়া ও তরুর ছায়ায় মিলিয়া বনের মধ্যে অকালে সন্ধ্যার আবির্ভাব হইয়াছে। শীতের সায়াহ্নে ভূমিতল হইতে কুয়াশার মতো বাষ্প উঠিতেছে। ঝিল্লির শব্দে নিস্তব্ধ বন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। বিল্বন যখন শিবিরে গিয়া পৌঁছিলেন তখন সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত গেছেন, কিন্তু পশ্চিম আকাশে সুবর্ণরেখা মিলাইয়া যায় নাই। পশ্চিম দিকের সমতল উপত্যকায় স্বর্ণচ্ছায়ায় রঞ্জিত ঘন বন নিস্তব্ধ সবুজ সমুদ্রের মতো দেখাইতেছে। সৈন্যেরা কাল প্রভাতে যাত্রা করিবে। রঘুপতি একদল সেনা ও সেনাপতিকে সঙ্গে লইয়া পথ-অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন, এখনো ফিরিয়া আসেন নাই। যদিও রঘুপতির অজ্ঞাতসারে নক্ষত্ররায়ের নিকটে কোনো লোক আসা নিষেধ ছিল, তথাপি সন্ন্যাসীবেশধারী বিল্বনকে কেহই বাধা দিল না।

বিল্বন নক্ষত্ররায়কে গিয়া কহিলেন, "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য আপনাকে স্মরণ করিয়া এই পত্র লিখিয়াছেন।" বলিয়া পত্র নক্ষত্ররায়ের হস্তে দিলেন। নক্ষত্ররায় কম্পিত হস্তে পত্র গ্রহণ করিলেন। সে পত্র খুলিতে তাঁহার লজ্জা ও ভয় হইতে লাগিল। যতক্ষণ রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁহার মধ্যে আড়াল করিয়া দাঁড়ায় ততক্ষণ নক্ষত্ররায় বেশ নিশ্চিন্ত থাকেন। তিনি কোনোমতেই গোবিন্দমাণিক্যকে যেন দেখিতে চান না। গোবিন্দমাণিক্যের এই দূত একেবারে নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে নক্ষত্ররায় কেমন যেন সংকুচিত হইয়া পড়িলেন, এবং মনে মনে ঈষৎ বিরক্ত হইলেন। ইচ্ছা হইতে লাগিল, রঘুপতি যদি উপস্থিত থাকিতেন এবং এই দূতকে তাঁহার কাছে আসিতে না দিতেন। মনের মধ্যে নানা ইতস্তত করিয়া পত্র খুলিলেন।

তাহার মধ্যে কিছুমাত্র ভর্ৎসনা ছিল না। গোবিন্দমাণিক্য তাঁহাকে লজ্জা দিয়া একটি কথাও বলেন নাই। ভাইয়ের প্রতি লেশমাত্র অভিমান

প্রকাশ করেন নাই। নক্ষত্ররায় যে সৈন্যসামন্ত লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন, সে কথার উল্লেখমাত্র করেন নাই। উভয়ের মধ্যে পূর্বে যেমন ভাব ছিল এখনও অবিকল যেন সেই ভাবই আছে। অথচ সমস্ত পত্রের মধ্যে একটি সুগভীর স্নেহ ও বিষাদ প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে— তাহা কোনো স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত হয় নাই বলিয়া নক্ষত্ররায়ের হৃদয়ে অধিক আঘাত লাগিল।

চিঠি পড়িতে পড়িতে অল্পে অল্পে তাঁহার মুখভাবের পরিবর্তন হইতে লাগিল। হৃদয়ের পাষাণ-আবরণ দেখিতে দেখিতে ফাটিয়া গেল। চিঠি তাঁহার কম্পমান হাতে কাঁপিতে লাগিল। সে চিঠি লইয়া কিয়ৎক্ষণ মাথায় ধারণ করিয়া রাখিলেন। সে চিঠির মধ্যে ভ্রাতার যে আশীর্বাদ ছিল তাহা যেন শীতল নির্ঝরের মতো তাঁহার তপ্ত হৃদয়ে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্থির হইয়া সুদূর পশ্চিমের সন্ধ্যারাগরক্ত শ্যামল বনভূমির দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। চারি দিকে নিস্তব্ধ সন্ধ্যা অতলস্পর্শ শব্দহীন শান্ত সমুদ্রের মতো জাগিয়া রহিল। ক্রমে তাঁহার চক্ষে জল দেখা দিল, দ্রুতবেগে অশ্রু পড়িতে লাগিল। সহসা লজ্জায় ও অনুতাপে নক্ষত্ররায় দুই হাতে মুখ প্রচ্ছন্ন করিয়া ধরিলেন।

কাঁদিয়া বলিলেন, "আমি এ রাজ্য চাই না। দাদা, আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিয়া আমাকে তোমার পদতলে স্থান দাও, আমাকে তোমার কাছে রাখিয়া দাও, আমাকে দূরে তাড়াইয়া দিয়ো না।"

বিল্বন একটি কথাও বলিলেন না— চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে নক্ষত্ররায় যখন প্রশান্ত হইলেন তখন বিল্বন কহিলেন, "যুবরাজ, আপনার পথ চাহিয়া গোবিন্দমাণিক্য বসিয়া আছেন, আর বিলম্ব করিবেন না।"

নক্ষত্ররায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে তিনি কি মাপ করিবেন?"

বিল্বন কহিলেন, "তিনি যুবরাজের প্রতি কিছুমাত্র রাগ করেন নাই।

অধিক রাত্রি হইলে পথে কষ্ট হইবে। শীঘ্র একটি অশ্ব লউন। পর্বতের নীচে মহারাজের লোক অপেক্ষা করিয়া আছে।”

নক্ষত্ররায় কহিলেন, “আমি গোপনে পলায়ন করি, সৈন্যদের কিছু জানাইয়া কাজ নাই। আর তিলমাত্র বিলম্ব করিয়া কাজ নাই, যত শীঘ্র এখান হইতে বাহির হইয়া পড়া যায় ততই ভালো।”

বিল্বন কহিলেন, “ঠিক কথা।”

তিনমুড়া পাহাড়ে সন্ন্যাসীর সহিত শিবলিঙ্গের পূজা করিতে যাইতেছেন বলিয়া নক্ষত্ররায় বিল্বনের সহিত অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন। অনুচরগণ সঙ্গে যাইতে চাহিল, তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন।

সবে বাহির হইয়াছেন মাত্র, এমন সময় অশ্বের খুরধ্বনি ও সৈন্যদের কোলাহল শুনিতে পাইলেন। নক্ষত্ররায় নিতান্ত সংকুচিত হইয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে রঘুপতি সৈন্য লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, “মহারাজ, কোথায় যাইতেছেন?” নক্ষত্ররায় কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না।

নক্ষত্ররায়কে নিরুত্তর দেখিয়া বিল্বন কহিলেন, “মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন।”

রঘুপতি বিল্বনের আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিলেন। একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, তার পরে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন, “আজ এমন অসময়ে আমরা আমাদের মহারাজকে বিদায় দিতে পারি না। ব্যস্ত হইবার তো কোনো কারণ নাই। কাল প্রাতঃকালে যাত্রা করিলেই তো হইবে। কী বলেন মহারাজ?”

নক্ষত্ররায় মৃদুস্বরে কহিলেন, “কাল সকালেই যাইব, আজ রাত হইয়া গেছে।”

বিল্বন নিরাশ হইয়া সে রাত্রি শিবিরেই যাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে নক্ষত্ররায়ের নিকট যাইবার চেষ্টা করিলেন, সৈন্যেরা বাধা

দিল। দেখিলেন, চতুর্দিকে পাহারা, কোনো দিকে ছিদ্র নাই। অবশেষে রঘুপতির নিকট গিয়া কহিলেন, "যাত্রার সময় হইয়াছে, যুবরাজকে সংবাদ দিন।"

রঘুপতি কহিলেন, "মহারাজ যাইবেন না স্থির করিয়াছেন।"

বিল্বন কহিলেন, "আমি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।"

রঘুপতি। সাক্ষাৎ হইবে না তিনি বলিয়া দিয়াছেন।

বিল্বন কহিলেন, "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের পত্রের উত্তর চাই।"

রঘুপতি। পত্রের উত্তর ইতিপূর্বে আর একবার দেওয়া হইয়াছে।

বিল্বন। আমি তাঁহার নিজমুখে উত্তর শুনিতে চাই।

রঘুপতি। তাহার কোনো উপায় নাই।

বিল্বন বুঝিলেন, বৃথা চেষ্টা; কেবল সময় ও বাক্য-ব্যয়। যাইবার সময় রঘুপতিকে বলিয়া গেলেন, "ব্রাহ্মণ, এ কী সর্বনাশ-সাধনে তুমি প্রবৃত্ত হইয়াছ! এ তো ব্রাহ্মণের কাজ নয়।"

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিল্বন ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন, ইতিমধ্যে রাজা কুকিদের বিদায় করিয়া দিয়াছেন। তাহারা রাজ্যমধ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। সৈন্যদল প্রায় ভাঙিয়া দিয়াছেন। যুদ্ধের উদ্যোগ বড়ো একটা কিছু নাই। বিল্বন ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে সমস্ত বিবরণ বলিলেন।

রাজা কহিলেন, "তবে ঠাকুর, আমি বিদায় হই। নক্ষত্রের জন্য রাজ্য ধন রাখিয়া দিয়া চলিলাম।"

বিল্বন কহিলেন, "অসহায় প্রজাদিগকে পরহস্তে ফেলিয়া দিয়া আপনি পলায়ন করিবেন, ইহা স্মরণ করিয়া আমি কোনোমতেই প্রসন্নমনে বিদায় দিতে পারি না মহারাজ! বিমাতার হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া ভারমুক্ত

মাতা শান্তিলাভ করিলেন— ইহা কি কল্পনা করা যায় ?”

রাজা কহিলেন, “ঠাকুর, তোমার বাক্য আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া প্রবেশ করে। কিন্তু এবার আমাকে মার্জনা করো, আমাকে আর অধিক কিছু বলিয়ো না। আমাকে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিয়ো না। তুমি জান ঠাকুর, আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম রক্তপাত আর করিব না ; সে প্রতিজ্ঞা আমি ভাঙিতে পারি না।”

বিল্বন কহিলেন, “তবে এখন মহারাজ কী করিবেন ?”

রাজা কহিলেন, “তবে তোমাকে সমস্ত বলি। আমি ধ্রুবকে সঙ্গে করিয়া বনে যাইব। ঠাকুর, আমার জীবন অত্যন্ত অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহার কিছুই করিতে পারি নাই— জীবনের যতখানি চলিয়া গেছে তাহা ফিরিয়া পাইয়া আর নূতন করিয়া গড়িতে পারিব না— আমার মনে হইতেছে ঠাকুর, অদৃষ্ট যেন আমাদিগকে তীরের মতো নিক্ষেপ করিয়াছে, লক্ষ্য হইতে যদি একবার একটু বাঁকিয়া গিয়া থাকি তবে আর যেন সহস্র চেষ্টায় লক্ষ্যের মুখে ফিরিতে পারি না। জীবনের আরম্ভ-সময়ে আমি সেই যে বাঁকিয়া গিয়াছি জীবনের শেষকালে আমি আর লক্ষ্য খুঁজিয়া পাইতেছি না। যাহা মনে করি তাহা আর হয় না। যে সময়ে জাগিলে আত্মরক্ষা করিতে পারিতাম সে সময়ে জাগি নাই, যে সময়ে ডুবিয়াছি তখন চৈতন্য হইয়াছে। সমুদ্রে পড়িলে লোকে যে ভাবে কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বন করে আমি বালক ধ্রুবকে সেই ভাবে অবলম্বন করিয়াছি। আমি ধ্রুবের মধ্যে আত্মসমাধান করিয়া ধ্রুবের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করিব। আমি প্রথম হইতে ধ্রুবকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিব। ধ্রুবের সহিত তিলে তিলে আমিই বাড়িতে থাকিব। আমার মানবজন্ম সম্পূর্ণ করিব। ঠাকুর, আমি মানুষের মতো নই, আমি রাজা হইয়া কী করিব।”

শেষ কথাটা রাজা অত্যন্ত আবেগের সহিত উচ্চারণ করিলেন। শুনিয়া

ধ্রুব রাজার হাঁটুর উপর তাহার মাথা ঘষিয়া ঘষিয়া কহিল, "আমি আজা।"

বিল্বন হাসিয়া ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইলেন। অনেক ক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অবশেষে রাজাকে কহিলেন, "বনে কি কখনো মানুষ গড়া যায়? বনে কেবল একটা উদ্ভিদ পালন করিয়া তোলা যাইতে পারে। মানুষ মনুষ্যসমাজেই গঠিত হয়।"

রাজা কহিলেন, "আমি নিতান্তই বনবাসী হইব না— মনুষ্যসমাজ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে থাকিব মাত্র অথচ সমাজের সহিত সমস্ত যোগ বিচ্ছিন্ন করিব না। এ কেবল দিন-কতকের জন্য।"

এ দিকে নক্ষত্ররায় সৈন্য-সমেত রাজধানীর নিকটবর্তী হইলেন। প্রজাদের ধনধান্য লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রজারা কেবল গোবিন্দ-মাণিক্যকেই অভিশাপ দিতে লাগিল। তাহারা কহিল, "এ-সমস্তই কেবল রাজার পাপে ঘটিতেছে।"

রাজা একবার রঘুপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। রঘুপতি উপস্থিত হইলে তাঁহাকে কহিলেন, "আর কেন প্রজাদিগকে কষ্ট দিতেছ? আমি নক্ষত্ররায়কে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছি। তোমার মোগল-সৈন্যদের বিদায় করিয়া দাও।"

রঘুপতি কহিলেন, "যে আজ্ঞা, আপনি বিদায় হইলেই আমি মোগল-সৈন্যদের বিদায় করিয়া দিব; ত্রিপুরা লুণ্ঠিত হয়, ইহা আমার ইচ্ছা নহে।"

রাজা সেই দিনই রাজ্য ছাড়িয়া যাত্রার উদ্যোগ করিলেন, তাঁহার রাজবেশ ত্যাগ করিলেন, গেরুয়াবসন পরিলেন। নক্ষত্ররায়কে রাজার সমস্ত কর্তব্য স্মরণ করাইয়া এক দীর্ঘ আশীর্বাদ-পত্র লিখিলেন।

অবশেষে রাজা ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া বলিলেন, "ধ্রুব, আমার সঙ্গে বনে যাবে বাছা?"

ধ্রুব তৎক্ষণাৎ রাজার গলা জড়াইয়া কহিল, "যাব।"

এমন সময় রাজার সহসা মনে হইল, ধ্রুবকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইলে তাহার খুড়া কেদারেশ্বরের সম্মতি আবশ্যক ; কেদারেশ্বরকে ডাকিয়া রাজা কহিলেন, "কেদারেশ্বর, তোমার সম্মতি পাইলে আমি ধ্রুবকে আমার সঙ্গে লইয়া যাই।"

ধ্রুব দিনরাত্রি রাজার কাছেই থাকিত, তাহার খুড়ার সহিত তাহার বড়ো একটা সম্পর্ক ছিল না, এইজন্যই বোধ করি রাজার কখনো মনে হয় নাই যে ধ্রুবকে সঙ্গে লইয়া গেলে কেদারেশ্বরের কোনো আপত্তি হইতে পারে।

রাজার কথা শুনিয়া কেদারেশ্বর কহিল, "সে আমি পারিব না মহারাজ!"

শুনিয়া রাজার চমক ভাঙিয়া গেল। সহসা তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "কেদারেশ্বর, তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো।"

কেদারেশ্বর। না মহারাজ, বনে যাইতে পারিব না।

রাজা কাতর হইয়া কহিলেন, "আমি বনে যাইব না, আমি ধনজন লইয়া লোকালয়ে থাকিব।"

কেদারেশ্বর কহিল, "আমি দেশ ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।"

রাজা কিছু না বলিয়া গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার সমস্ত আশা ম্রিয়মাণ হইয়া গেল। নিমেষের মধ্যে সমস্ত ধরণীর মুখ যেন পরিবর্তিত হইয়া গেল। ধ্রুব আপন মনে খেলা করিতেছিল— অনেক ক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, অথচ তাহাকে যেন চোখে দেখিতে পাইলেন না। ধ্রুব তাঁহার কাপড়ের প্রান্ত ধরিয়া টানিয়া কহিল, "খেলা করো।"

রাজার সমস্ত হৃদয় গলিয়া অশ্রু হইয়া চোখের কাছে আসিল, অনেক

কষ্টে অশ্রুজল দমন করিলেন। মুখ ফিরাইয়া ভগ্নহৃদয়ে কহিলেন, "তবে ধ্রুব রহিল। আমি একাই যাই।" অবশিষ্ট জীবনের সুদীর্ঘ মরুময় পথ যেন নিমেষের মধ্যে বিদ্যুদালোকে তাঁহার চক্ষুতারকায় অঙ্কিত হইল।

কেদারেশ্বর ধ্রুবের খেলা ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে বলিল, "আয়, আমার সঙ্গে আয়।" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিল।

ধ্রুব ক্রন্দনের স্বরে বলিয়া উঠিল, "না।"

রাজা সচকিত হইয়া ধ্রুবের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। ধ্রুব ছুটিয়া আসিয়া রাজাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকাইল। রাজা ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিলেন। বিশাল হৃদয় বিদীর্ণ হইতে চাহিতেছিল, ক্ষুদ্র ধ্রুবকে বুকের কাছে চাপিয়া হৃদয়কে দমন করিলেন। ধ্রুবকে সেই অবস্থায় কোলে রাখিয়া তিনি দীর্ঘ কক্ষে পদচারণ করিতে লাগিলেন। ধ্রুব কাঁধে মাথা রাখিয়া অত্যন্ত স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল।

অবশেষে যাত্রার সময় হইল। ধ্রুব রাজার কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘুমন্ত ধ্রুবকে ধীরে ধীরে কেদারেশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া রাজা যাত্রা করিলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পূর্বদ্বার দিয়া সৈন্যসামন্ত লইয়া নক্ষত্ররায় রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন, কিঞ্চিৎ অর্থ ও গুটিকতক অনুচর লইয়া পশ্চিমদ্বারাভিমুখে গোবিন্দমাণিক্য যাত্রা করিলেন। নগরের লোক বাঁশি বাজাইয়া, ঢাক-ঢোলের শব্দ করিয়া, হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির সহিত নক্ষত্ররায়কে আহ্বান করিল। গোবিন্দমাণিক্য যে পথ দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন সে পথে কেহই তাঁহাকে সমাদর করা আবশ্যক বিবেচনা করিল না। দুই পার্শ্বের কুটিরবাসিনী রমণীরা তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া গালি দিতে লাগিল;

ক্ষুধায় ও ক্ষুধিত সন্তানদের ক্রন্দনে তাহাদের জিহ্বা শাণিত হইয়াছে। পরশ্ব গুরুতর দুর্ভিক্ষের সময় যে বৃদ্ধা রাজদ্বারে গিয়া আহার পাইয়াছিল এবং রাজা স্বয়ং যাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন সে তাহার শীর্ণ হস্ত তুলিয়া রাজাকে অভিশাপ দিতে লাগিল। ছেলেরা জননীর কাছ হইতে শিক্ষা পাইয়া বিদ্রূপ করিয়া চীৎকার করিতে করিতে রাজার পিছন পিছন চলিল।

দক্ষিণে বামে কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, সম্মুখে চাহিয়া, রাজা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। একজন জুমিয়া ক্ষেত্র হইতে আসিতেছিল, সে রাজাকে দেখিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল। রাজার হৃদয় আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি তাহার নিকটে স্নেহ-আকুল কণ্ঠে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। কেবল এই একটি জুমিয়া তাঁহার সমুদয় সন্তান প্রজাদের হইয়া তাঁহার রাজত্বের অবসানে তাঁহাকে ভক্তিভরে ম্লানহৃদয়ে বিদায় দিল। রাজার পশ্চাতে ছেলের পাল চীৎকার করিতেছে দেখিয়া সে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে তাড়া করিয়া গেল। রাজা তাহাকে নিষেধ করিলেন।

অবশেষে পথের যে অংশে কেদারেশ্বরের কুটির ছিল, রাজা সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন একবার দক্ষিণে ফিরিয়া চাহিলেন। এখন শীতের প্রাতঃকাল। কুয়াশা কাটিয়া সূর্যরশ্মি সবে দেখা দিয়াছে। কুটিরের দিকে চাহিয়া রাজার গত বৎসরের আষাঢ় মাসের এক প্রাতঃকাল মনে পড়িল। তখন ঘনমেঘ ঘনবর্ষা। দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রের ন্যায় বালিকা হাসি অচেতনে শয্যার প্রান্তে মিলাইয়া শুইয়া আছে। ক্ষুদ্র তাতা তাহা কিছুই না বুঝিতে পারিয়া কখনো বা দিদির অঞ্চলের প্রান্ত মুখে পুরিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া আছে, কখনো বা তাহার গোল গোল ছোটো ছোটো মোটা মোটা হাত দিয়া আস্তে আস্তে দিদির মুখ চাপড়াইতেছে। আজিকার এই অগ্রহায়ণ মাসের

শিশিরসিক্ত শুভ্র প্রাতঃকাল সেই আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। রাজার কি মনে পড়িল যে, যে অদৃষ্ট আজ তাঁহাকে রাজ্যত্যাগী ও অপমানিত করিয়া গৃহ হইতে বিদায় করিয়া দিতেছে সেই অদৃষ্ট এই ক্ষুদ্র কুটিরদ্বারে সেই আষাঢ়ের অন্ধকার প্রাতঃকালে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল? এইখানেই তাহার সহিত সেই প্রথম সাক্ষাৎ। রাজা অন্যমনস্ক হইয়া এই কুটিরের সম্মুখে কিছু ক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। তাঁহার অনুচরগণ ছাড়া তখন পথে আর কেহ লোক ছিল না। জুমিয়ার নিকট তাড়া খাইয়া ছেলেগুলো পালাইয়াছে, কিন্তু জুমিয়া দূরবর্তী হইতেই আবার তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাদের চীৎকারে চেতনালাভ করিয়া, নিশ্বাস ফেলিয়া, রাজা আবার ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন।

সহসা বালকদিগের চীৎকারের মধ্যে একটি সুমিষ্ট পরিচিত কণ্ঠ তাঁহার কানে আসিয়া প্রবেশ করিল। দেখিলেন, ছোটো ধ্রুব তাহার ছোটো ছোটো পা ফেলিয়া দুই হাত তুলিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিতেছে। কেদারেশ্বর নূতন রাজাকে আগেভাগে সম্মান প্রদর্শন করিতে গিয়াছে, কুটিরে কেবল ধ্রুব এবং এক বৃদ্ধা পরিচারিকা ছিল। গোবিন্দমাণিক্য ঘোড়া থামাইয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলেন। ধ্রুব ছুটিয়া খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া একেবার তাঁহার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ধ্রুব তাঁহার কাপড় ধরিয়া টানিয়া, তাঁহার হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া, তাহার প্রথম আনন্দের উচ্ছ্বাস অবসান হইলে পর গম্ভীর হইয়া রাজাকে বলিল, "আমি টক্‌টক্‌ চ'ব।"

রাজা তাহাকে ঘোড়ায় চড়াইয়া দিলেন। ঘোড়ার উপর চড়িয়া সে রাজার গলা জড়াইয়া ধরিল, এবং তাহার কোমল কপোলখানি রাজার কপোলের উপর নিবিষ্ট করিয়া রহিল। ধ্রুব তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে রাজার মধ্যে কী একটা পরিবর্তন অনুভব করিতে লাগিল।

গভীর ঘুম ভাঙাইবার জন্য লোকে যেমন নানারূপ চেষ্টা করে, ধ্রুব তেমনি তাঁহাকে টানিয়া, তাঁহাকে জড়াইয়া, তাঁহাকে চুমো খাইয়া, কোনোক্রমে তাঁহার পূর্বভাব ফিরাইয়া আনিবার অনেক চেষ্টা করিল। অবশেষে অকৃতকার্য হইয়া মুখের মধ্যে গোটা দুয়েক আঙুল পুরিয়া দিয়া বসিয়া রহিল। রাজা ধ্রুবের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বার বার চুম্বন করিলেন।

অবশেষে কহিলেন, "ধ্রুব, আমি তবে যাই।"

ধ্রুব রাজার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি যাব।"

রাজা কহিলেন, "তুমি কোথায় যাবে, তুমি তোমার কাকার কাছে থাকো।"

ধ্রুব কহিল, "না, আমি যাব।"

এমন সময় কুটির হইতে বৃদ্ধা পরিচারিকা বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে উপস্থিত হইল, সবেগে ধ্রুবের হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, "চল্।"

ধ্রুব অমনি সভয়ে সবলে দুই হাতে রাজাকে জড়াইয়া রাজার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া রাখিল। রাজা কাতর হইয়া ভাবিলেন বক্ষের শিরা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা যায়, তবু এ দুটি হাতের বন্ধন কি ছেঁড়া যায়? কিন্তু, তাও ছিঁড়িতে হইল। আস্তে আস্তে ধ্রুবের দুই হাত খুলিয়া বলপূর্বক ধ্রুবকে পরিচারিকার হাতে দিলেন। ধ্রুব প্রাণপণে কাঁদিয়া উঠিল; হাত তুলিয়া কহিল, "বাবা, আমি যাব।" রাজা আর পিছনে না চাহিয়া দ্রুত ঘোড়ায় চড়িয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। যত দূর যান ধ্রুবের আকুল ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন; ধ্রুব কেবল তাহার দুই হাত তুলিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা, আমি যাব।" অবশেষে রাজার প্রশান্তচক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি আর পথঘাট কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বাষ্পজালে সূর্যালোক এবং সমস্ত জগৎ যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

ঘোড়া যে দিকে ইচ্ছা ছুটিতে লাগিল।

পথের মধ্যে এক জায়গায় এক-দল মোগল-সৈন্য আসিয়া রাজাকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে লাগিল, এমন-কি তাঁহার অনুচরদের সহিত কিঞ্চিৎ কঠোর বিদ্রূপ আরম্ভ করিল। রাজার একজন সভাসদ অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন, তিনি এই দৃশ্য দেখিয়া রাজার নিকটে ছুটিয়া আসিলেন। কহিলেন, "মহারাজ, এ অপমান তো আর সহ্য হয় না। মহারাজের এই দীনবেশ দেখিয়া ইহারা এরূপ সাহসী হইয়াছে। এই লউন তরবারি, এই লউন উষ্ণীষ। মহারাজ, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমি আমার লোক লইয়া আসিয়া এই বর্বরদিগকে একবার শিক্ষা দিই।"

রাজা কহিলেন, "না নয়নরায়, আমার তরবারি-উষ্ণীষে প্রয়োজন নাই। ইহারা আমার কী করিবে? আমি এখন ইহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর অপমান সহ্য করিতে পারি। মুক্ত তরবারি তুলিয়া আমি এ পৃথিবীর লোকের নিকট হইতে আর সম্মান আদায় করিতে চাহি না। পৃথিবীর সর্বসাধারণে যেরূপ সুসময়ে ও দুঃসময়ে মান-অপমান সুখদুঃখ সহ্য করিয়া থাকে আমিও জগদীশ্বরের মুখ চাহিয়া সেইরূপ সহ্য করিব। বন্ধুরা বিপক্ষ হইতেছে, আশ্রিতেরা কৃতঘ্ন হইতেছে, প্রণতেরা দুর্বিনীত হইয়া উঠিতেছে, এক কালে হয়তো ইহা আমার অসহ্য হইত, কিন্তু এখন ইহা সহ্য করিয়াই আমি হৃদয়ের মধ্যে আনন্দ লাভ করিতেছি। যিনি আমার বন্ধু তাঁহাকে আমি জানিয়াছি। যাও নয়নরায়, তুমি ফিরিয়া যাও, নক্ষত্রকে সমাদরপূর্বক আহ্বান করিয়া আনো, আমাকে যেমন সম্মান করিতে নক্ষত্রকেও তেমনি সম্মান করিয়ো। তোমরা সকলে মিলিয়া সর্বদা নক্ষত্রকে সুপথে এবং প্রজার কল্যাণে রক্ষা করো, তোমাদের কাছে আমার বিদায়কালের এই প্রার্থনা। দেখিয়ো, ভ্রমেও কখনো যেন আমার কথা উল্লেখ করিয়া বা আমার সহিত তুলনা করিয়া তাহার তিলমাত্র নিন্দা করিয়ো না। তবে আমি বিদায় হই।" বলিয়া রাজা

তাঁহার সভাসদের সহিত কোলাকুলি করিয়া অগ্রসর হইলেন, সভাসদ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অশ্রুজল মুছিয়া চলিয়া গেলেন।

যখন গোমতীতীরের উচ্চ পাড়ের কাছে গিয়া পৌঁছিলেন তখন বিল্বন ঠাকুর অরণ্য হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া অঞ্জলি তুলিয়া কহিলেন, "জয় হউক।"

রাজা অশ্ব হইতে নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

বিল্বন কহিলেন, "আমি আপনার কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

রাজা কহিলেন, "ঠাকুর, তুমি নক্ষত্রের কাছে থাকিয়া তাহাকে সৎপরামর্শ দাও। রাজ্যের হিতসাধন করো।"

বিল্বন কহিলেন, "না। আপনি যেখানে রাজা নহেন সেখানে আমি অকর্মণ্য। এখানে থাকিয়া আমি আর কোনো কাজ করিতে পারিব না।"

রাজা কহিলেন, "তবে কোথায় যাইবে ঠাকুর? আমাকে তবে দয়া করো, তোমাকে পাইলে আমি দুর্বল হৃদয়ে বল পাই।"

বিল্বন কহিলেন, "কোথায় আমার কাজ আছে আমি তাহাই অনুসন্ধান করিতে চলিলাম। আমি কাছে থাকি আর দূরে থাকি আপনার প্রতি আমার প্রেম কখনো বিচ্ছিন্ন হইবে না জানিবেন। কিন্তু, আপনার সহিত বনে গিয়া কী করিব?"

রাজা মৃদুস্বরে কহিলেন, "তবে আমি বিদায় হই।" বলিয়া দ্বিতীয় বার প্রণাম করিলেন। বিল্বন এক দিকে চলিয়া গেলেন, রাজা অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্ররায় ছত্রমাণিক্য নাম ধারণ করিয়া মহাসমারোহে রাজপদ গ্রহণ করিলেন। রাজকোষে অর্থ অধিক ছিল না। প্রজাদের যথাসর্বস্ব

হরণ করিয়া প্রতিশ্রুত অর্থ দিয়া মোগল-সৈন্যদের বিদায় করিতে হইল। ঘোরতর দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য লইয়া ছত্রমাণিক্য রাজত্ব করিতে লাগিলেন। চতুর্দিক হইতে অভিশাপ ও ক্রন্দন বর্ষিত হইতে লাগিল।

যে আসনে গোবিন্দমাণিক্য বসিতেন, যে শয্যায় গোবিন্দমাণিক্য শয়ন করিতেন, যে-সকল লোক গোবিন্দমাণিক্যের প্রিয় সহচর ছিল, তাহারা যেন রাত্রিদিন নীরবে ছত্রমাণিক্যকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। ছত্রমাণিক্যের ক্রমে তাহা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তিনি চোখের সম্মুখ হইতে গোবিন্দমাণিক্যের সমস্ত চিহ্ন মুছিতে আরম্ভ করিলেন। গোবিন্দমাণিক্যের ব্যবহার্য সামগ্রী নষ্ট করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার প্রিয় অনুচরদিগকে দূর করিয়া দিলেন। গোবিন্দমাণিক্যের নামগন্ধ তিনি আর সহ্য করিতে পারিতেন না। গোবিন্দমাণিক্যের কোনো উল্লেখ হইলেই তাঁহার মনে হইত, সকলে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই এই উল্লেখ করিতেছে। সর্বদা মনে হইত, সকলে তাঁহাকে রাজা বলিয়া যথেষ্ট সম্মান করিতেছে না— এইজন্য সহসা অকারণে ক্ষাপা হইয়া উঠিতেন, সভাসদ্‌দিগকে শশব্যস্ত থাকিতে হইত।

তিনি রাজকার্য কিছুই বুঝিতেন না, কিন্তু কেহ পরামর্শ দিতে আসিলে তিনি চটিয়া উঠিয়া বলিতেন, "আমি আর এইটে বুঝি নে! তুমি কি আমাকে নির্বোধ পাইয়াছ!"

তাঁহার মনে হইত, সকলে তাঁহাকে সিংহাসনে অনধিকারী রাজ্যাপহারক জ্ঞান করিয়া মনে মনে তাচ্ছিল্য করিতেছে, এই জন্য সজোরে অত্যধিক রাজা হইয়া উঠিলেন। যথেচ্ছাচরণ করিয়া সর্বত্র তাঁহার একাধিপত্য প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি যে রাখিলে রাখিতে পারেন, মারিলে মারিতে পারেন, ইহা বিশেষরূপে প্রমাণ করিবার জন্য যাহাকে রাখা উচিত নহে তাহাকে রাখিলেন, যাহাকে মারা উচিত নহে তাহাকে মারিলেন। প্রজারা অন্নাভাবে মরিতেছে, কিন্তু তাঁহার দিন-

রাত্রি সমারোহের শেষ নাই— অহরহ নৃত্যগীত বাদ্য ভোজ। ইতিপূর্বে আর-কোনো রাজা সিংহাসনে চড়িয়া বসিয়া রাজত্বের পেখম সমস্তটা ছড়াইয়া দিয়া এমন অপূর্ব নৃত্য করে নাই।

প্রজারা চারি দিকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল— ছত্রমাণিক্য তাহাতে অত্যন্ত জ্বলিয়া উঠিলেন; তিনি মনে করিলেন, এ কেবল রাজার প্রতি অসম্মানপ্রদর্শন। তিনি অসন্তোষের দ্বিগুণ কারণ জন্মাইয়া দিয়া বলপূর্বক, পীড়নপূর্বক, ভয় দেখাইয়া সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন— সমস্ত রাজ্য নিদ্রিত নিশীথের মতো নীরব হইয়া গেল। সেই শান্ত নক্ষত্র-রায় ছত্রমাণিক্য হইয়া যে সহসা এরূপ আচরণ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। অনেক সময়েই দুর্বলহৃদয়েরা প্রভুত্ব পাইলে এইরূপ প্রচণ্ড ও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠে।

রঘুপতির কাজ শেষ হইয়া গেল। শেষ পর্যন্তই যে প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে সমান জাগ্রত ছিল তাহা নহে। ক্রমে প্রতিহিংসার ভাব ঘুচিয়া গিয়া যে কাজে হাত দিয়াছেন সেই কাজটা সম্পন্ন করিয়া তোলাই তাঁহার একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। নানা কৌশলে বাধাবিপত্তি সমস্ত অতিক্রম করিয়া দিনরাত্রি একটা উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি একপ্রকার মাদক সুখ অনুভব করিতেছিলেন। অবশেষে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গেল। পৃথিবীতে আর কোথাও সুখ নাই।

রঘুপতি তাঁহার মন্দিরে গিয়া দেখিলেন, সেখানে জনপ্রাণী নাই। যদিও রঘুপতি বিলক্ষণ জানিতেন যে, জয়সিংহ নাই, তথাপি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া যেন দ্বিতীয়বার নূতন করিয়া জানিলেন যে, জয়সিংহ নাই। এক-একবার মনে হইতে লাগিল যেন আছে, তার পরে স্মরণ হইতে লাগিল যে নাই। সহসা বায়ুতে কপাট খুলিয়া গেল; তিনি চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, জয়সিংহ আসিল না। জয়সিংহ যে ঘরে থাকিত, মনে হইল, সে ঘরে জয়সিংহ থাকিতেও পারে— কিন্তু

অনেক ক্ষণ সে ঘরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না; মনে ভয় হইতে লাগিল, পাছে গিয়া দেখেন জয়সিংহ সেখানে নাই।

অবশেষে যখন গোধূলির ঈষৎ অন্ধকারে বনের ছায়া গাঢ়তর ছায়ায় মিলাইয়া গেল তখন রঘুপতি ধীরে ধীরে জয়সিংহের গৃহে প্রবেশ করিলেন— শূন্য বিজন গৃহ সমাধিভবনের মতো নিস্তব্ধ। ঘরের মধ্যে এক পাশে একটি কাঠের সিন্দুক এবং সিন্দুকের পার্শ্বে জয়সিংহের একজোড়া খড়ম ধূলিমলিন হইয়া পড়িয়া আছে। ভিত্তিতে জয়সিংহের স্বহস্তে আঁকা কালীমূর্তি। ঘরের পূর্বকোণে একটি ধাতুপ্রদীপ ধাতু-আধারের উপর দাঁড়াইয়া আছে, গত বৎসর হইতে সে প্রদীপ কেহ জ্বালায় নাই— মাকড়সার জালে সে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। নিকটবর্তী দেয়ালে প্রদীপ-শিখার কালো দাগ পড়িয়া আছে। গৃহে পূর্বোক্ত কয়েকটি দ্রব্য ছাড়া আর কিছুই নাই। রঘুপতি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। সে নিশ্বাস শূন্য গৃহে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। ক্রমে অন্ধকারে আর কিছুই দেখা যায় না। একটা টিকটিকি মাঝে মাঝে কেবল টিক্ টিক্ শব্দ করিতে লাগিল। মুক্ত দ্বার দিয়া ঘরের মধ্যে শীতের বায়ু প্রবেশ করিতে লাগিল। রঘুপতি সিন্দুকের উপর বসিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

এইরূপে একমাস এই বিজন মন্দিরে কাটাইলেন, কিন্তু এমন করিয়া আর দিন কাটে না। পৌরোহিত্য ছাড়িতে হইল। রাজসভায় গেলেন। রাজশাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, অবিচার উৎপীড়ন ও বিশৃঙ্খলা ছত্রমাণিক্য নাম ধরিয়া রাজত্ব করিতেছে। তিনি রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। ছত্রমাণিক্যকে পরামর্শ দিতে গেলেন।

ছত্রমাণিক্য চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, রাজ্যশাসনকার্যের তুমি কী জান? এ-সব বিষয় তুমি কিছু বুঝ না।"

রঘুপতি রাজার প্রতাপ দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। দেখিলেন

সে নক্ষত্ররায় আর নাই। রঘুপতির সহিত রাজার ক্রমাগত খিটিমিটি বাধিতে লাগিল। ছত্রমাণিক্য মনে করিলেন যে, রঘুপতি কেবলই ভাবিতেছে যে, রঘুপতিই তাঁহাকে রাজা করিয়া দিয়াছে। এইজন্য রঘুপতিকে দেখিলে তাঁহার অসহ্য বোধ হইত।

অবশেষে একদিন স্পষ্ট বলিলেন, "ঠাকুর, তুমি তোমার মন্দিরের কাজ করো গে। রাজসভায় তোমার কোনো প্রয়োজন নাই।"

রঘুপতি ছত্রমাণিক্যের প্রতি জ্বলন্ত তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ছত্রমাণিক্য ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্ররায় যেদিন নগর-প্রবেশ করেন কেদারেশ্বর সেই দিনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়; কিন্তু বহু চেষ্টাতেও সে তাঁহার নজরে পড়িল না। সৈন্যেরা ও প্রহরীরা তাহাকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া তাড়া দিয়া, নাড়া দিয়া, বিব্রত করিয়া তুলিল। অবশেষে সে প্রাণ লইয়া পালাইয়া যায়। গোবিন্দমাণিক্যের আমলে সে রাজভোগে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া প্রাসাদে বাস করিত—যুবরাজ নক্ষত্ররায়ের সহিত তাহার বিশেষ প্রণয়ও ছিল। কিছুকাল প্রাসাদচ্যুত হইয়া তাহার জীবনধারণ করা দায় হইয়া উঠিয়াছে; যখন সে রাজার ছায়ায় ছিল তখন সকলে তাহাকে সভয়ে সম্মান করিত, কিন্তু এখন তাহাকে কেহই আর গ্রাহ্য করে না। পূর্বে রাজসভায় কাহারো কিছু প্রয়োজন হইলে আসিয়া তাহাকে হাতে-পায়ে ধরিত, এখন পথ দিয়া চলিবার সময় কেহ তাহার সঙ্গে দুটো কথা কহিবার অবসর পায় না। ইহার উপরে আবার অন্নকষ্টও হইয়াছে। এমন অবস্থায় প্রাসাদে পুনর্বার প্রবেশ করিতে পারিলে তাহার বিশেষ সুবিধা হয়। সে একদিন অবসরমত কিছু ভেট সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ্য রাজ-দরবারে ছত্রমাণিক্যের সহিত দেখা করিতে গেল। পরম পরিতোষ-

প্রকাশপূর্বক অত্যন্ত পোষ-মানা বিনীত হাস্য হাসিতে হাসিতে রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাজা তাহাকে দেখিয়াই জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "হাসি কিসের জন্য! তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা পাইয়াছ! তুমি এ কি রহস্য করিতে আসিয়াছ!"

অমনি চোপদার জমাদার বরকন্দাজ মন্ত্রী অমাত্য সকলেই হাঁকার দিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ কেদারেশ্বরের বিকশিত দন্তপংক্তির উপর যবনিকাপতন হইল।

ছত্রমাণিক্য কহিলেন, "তোমার কী বলিবার আছে শীঘ্র বলিয়া চলিয়া যাও।"

কেদারেশ্বরের কী বলিবার ছিল মনে পড়িল না। অনেক কষ্টে সে মনে মনে যে বক্তৃতাটুকু গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা পেটের মধ্যেই চুরমার হইয়া গেল।

অবশেষে রাজা যখন বলিলেন, "তোমার যদি কিছু বলিবার না থাকে তো চলিয়া যাও" তখন কেদারেশ্বর চট্‌পট্ একটা যা হয় কিছু বলা আবশ্যক বিবেচনা করিল।

চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে সহসা প্রচুর পরিমাণে করুণরস সঞ্চার করিয়া বলিল, "মহারাজ, ধ্রুবকে কি ভুলিয়া গিয়াছেন?"

ছত্রমাণিক্য অত্যন্ত আগুন হইয়া উঠিলেন। মূর্খ কেদারেশ্বর কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "সে যে মহারাজের জন্য 'কাকা কাকা' করিয়া কাঁদিয়া সারা হইতেছে।"

ছত্রমাণিক্য কহিলেন, "তোমার আস্পর্ধা তো কম নয় দেখিতেছি। তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে কাকা বলে! তুমি তাহাকে এই শিক্ষা দিয়াছ!"

কেদারেশ্বর অত্যন্ত কাতরভাবে জোড়হস্তে কহিল, "মহারাজ—"

ছত্রমাণিক্য কহিলেন, "কে আছ হে— ইহাকে আর সেই ছেলেটাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দাও তো।"

সহসা স্কন্ধের উপর এতগুলো প্রহরীর হাত আসিয়া পড়িল যে, কেদারেশ্বর তীরের মতো একেবারে বাহিরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। হাত হইতে তাহার ডালি কাড়িয়া লইয়া প্রহরীরা তাহা ভাগ করিয়া লইল। ধ্রুবকে লইয়া কেদারেশ্বর ত্রিপুরা পরিত্যাগ করিল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

রঘুপতি আবার মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন, কোনো প্রেমপূর্ণ হৃদয় বস্ত্রাদি লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই। পাষাণ-মন্দির দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মধ্যে কোথাও হৃদয়ের লেশমাত্র নাই। তিনি গিয়া গোমতীতীরের শ্বেত সোপানের উপর বসিলেন। সোপানের বাম পার্শ্বে জয়সিংহের স্বহস্তে রোপিত শেফালিকা গাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে। এই ফুলগুলি দেখিয়া জয়সিংহের সুন্দর মুখ, সরল হৃদয় সরল জীবন এবং অত্যন্ত সহজ বিশুদ্ধ উন্নত ভাব তাঁহার স্পষ্ট মনে পড়িতে লাগিল। সিংহের ন্যায় সবল তেজস্বী এবং হরিণশিশুর মতো সুকুমার জয়সিংহ রঘুপতির হৃদয়ে সম্পূর্ণ আবির্ভূত হইল, তাঁহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। ইতিপূর্বে তিনি আপনাকে জয়সিংহের চেয়ে অনেক বড়ো জ্ঞান করিতেন, এখন জয়সিংহকে তাঁহার নিজের চেয়ে অনেক বড়ো মনে হইতে লাগিল। তাঁহার প্রতি জয়সিংহের সেই সরল ভক্তি স্মরণ করিয়া জয়সিংহের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভক্তির উদয় হইল, এবং নিজের প্রতি তাঁহার অভক্তি জন্মিল। জয়সিংহকে যে-সকল অন্যায় তিরস্কার করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। তিনি মনে মনে কহিলেন, 'জয়সিংহকে ভর্ৎসনার আমি অধিকারী নই; জয়সিংহের সহিত যদি এক মুহূর্তের জন্য একটিবার দেখা হয় তবে

আমি আমার হীনত্ব স্বীকার করিয়া তাহার নিকট একবার মার্জনা প্রার্থনা করি।' জয়সিংহ যখন যাহা যাহা বলিয়াছে করিয়াছে, সমস্ত তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। জয়সিংহের সমস্ত জীবন সংহত ভাবে তাঁহার মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি এইরূপ একটি মহৎ চরিত্রের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া সমস্ত বিবাদ বিদ্বেষ ভুলিয়া গেলেন। চারি দিকের গুরুভার সংসার লঘু হইয়া গিয়া তাঁহাকে পীড়ন করিতে বিরত হইল। যে নক্ষত্রমাণিক্যকে তিনিই রাজা করিয়া দিয়াছেন সে যে রাজা হইয়া তাঁহাকেই অপমান করিয়াছে ইহা স্মরণ করিয়া তাঁহার কিছুমাত্র রোষ জন্মিল না। এই মান-অপমান সমস্তই সামান্য মনে করিয়া তাঁহার ঈষৎ হাসি আসিল। কেবল তাঁহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, জয়সিংহ যাহাতে যথার্থ সন্তুষ্ট হয় এমন একটা-কিছু কাজ করেন। অথচ চতুর্দিকে কাজ কিছুই দেখিতে পাইলেন না— চতুর্দিকে শূন্য হাহাকার করিতেছে। এই বিজন মন্দির তাঁহাকে যেন চাপিয়া ধরিল, তাঁহার যেন নিশ্বাস রোধ করিল। একটা-কিছু বৃহৎ কাজ করিয়া তিনি হৃদয়বেদনা শান্ত করিয়া রাখিবেন, কিন্তু এই-সকল নিস্তব্ধ নিরুদ্যম নিরালয় মন্দিরের দিকে চাহিয়া পিঞ্জরবদ্ধ পাখির মতো তাঁহার হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া বনের মধ্যে অধীর ভাবে পদচারণ করিতে লাগিলেন। মন্দিরের ভিতরকার অলস অচেতন অকর্মণ্য জড়প্রতিমাগুলির প্রতি তাঁহার অতিশয় ঘৃণার উদয় হইল। হৃদয় যখন বেগে উদ্‌বেল হইয়া উঠিয়াছে তখন কতকগুলি নিরুদ্যম স্থূল পাষাণমূর্তির নিরুদ্যম সহচর হইয়া চিরদিন অতিবাহিত করা তাঁহার নিকটে অত্যন্ত হেয় বলিয়া বোধ হইল। যখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইল, রঘুপতি চকমকি ঠুকিয়া একটি প্রদীপ জ্বালাইলেন। দীপ-হস্তে চতুর্দশ দেবতার মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখিলেন, চতুর্দশ দেবতা সমান ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে; গত বৎসর আষাঢ়ের কালরাত্রে ক্ষীণ দীপালোকে ভক্তের মৃতদেহের সম্মুখে রক্ত-

প্রবাহের মধ্যে যেমন বুদ্ধিহীন হৃদয়হীনের মতো দাঁড়াইয়া ছিল, আজও তেমনি দাঁড়াইয়া আছে। রঘুপতি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মিথ্যা কথা! সমস্ত মিথ্যা! হা বৎস জয়সিংহ, তোমার অমূল্য হৃদয়ের রক্ত কাহাকে দিলে! এখানে কোনো দেবতা নাই, কোনো দেবতা নাই! পিশাচ রঘুপতি সে রক্ত পান করিয়াছে!" বলিয়া কালীর প্রতিমা রঘুপতি আসন হইতে টানিয়া তুলিয়া লইলেন। মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সবলে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অন্ধকারে পাষাণসোপানের উপর দিয়া পাষাণ-প্রতিমা শব্দ করিয়া গড়াইতে গড়াইতে গোমতীর জলের মধ্যে পড়িয়া গেল। অজ্ঞানরাক্ষসী পাষাণ-আকৃতি ধারণ করিয়া এতদিন রক্তপান করিতেছিল, সে আজ গোমতীগর্ভের সহস্র পাষাণের মধ্যে অদৃশ্য হইল, কিন্তু মানবের কঠিন হৃদয়াসন কিছুতেই পরিত্যাগ করিল না। রঘুপতি দীপ নিবাইয়া দিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেন, সেই রাত্রেই রাজধানী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নোয়াখালির নিজামৎপুরে বিল্বন ঠাকুর কিছুদিন হইতে বাস করিতে-ছেন। সেখানে ভয়ংকর মড়কের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি একদিন সমস্ত দিন মেঘ করিয়া থাকে, মাঝে মাঝে অল্প অল্প বৃষ্টিও হয়। অবশেষে সন্ধ্যার সময় রীতিমত ঝড় আরম্ভ হয়। প্রথমে পূর্বদিক হইতে বায়ু বহিতে থাকে। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় উত্তর ও উত্তর-পূর্ব হইতে প্রবল বেগে ঝড় বহিতে লাগিল। অবশেষে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া ঝড়ের বেগ কমিয়া গেল। এমন সময়ে রব উঠিল 'বন্যা আসিতেছে'। কেহ ঘরের চালে উঠিল, কেহ পুষ্করিণীর পাড়ের উপর গিয়া দাঁড়াইল, কেহ বৃক্ষশাখায় কেহ মন্দিরের চূড়ায় আশ্রয় লইল। অন্ধকার রাত্রি, অবিশ্রাম বৃষ্টি—

বন্যার গর্জন ক্রমে নিকটবর্তী হইল, আতঙ্কে গ্রামের লোকেরা দিশাহারা হইয়া গেল। এমন সময়ে বন্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। উপরি-উপরি দুইবার তরঙ্গ আসিল, দ্বিতীয়বারের পরে গ্রামে প্রায় আট হাত জল দাঁড়াইল। পরদিন যখন সূর্য উঠিল এবং জল নামিয়া গেল তখন দেখা গেল— গ্রামে গৃহ অল্পই অবশিষ্ট আছে এবং লোক নাই; অন্য গ্রাম হইতে মানুষ-গোরু মহিষ-ছাগল এবং শৃগাল-কুকুরের মৃতদেহ ভাসিয়া আসিয়াছে। সুপারির গাছগুলা ভাঙিয়া ভাসিয়া গেছে, গুঁড়ির কিয়দংশ মাত্র অবশিষ্ট আছে। বড়ো বড়ো আম-কাঁঠালের গাছ সমূলে উৎপাটিত হইয়া কাত হইয়া পড়িয়া আছে। অন্য গ্রামের গৃহের চাল ভাসিয়া আসিয়া ভিত্তির শোকে ইতস্তত উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। অনেক-গুলো হাঁড়ি-কলসী বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। অধিকাংশ কুটিরই বাঁশঝাড় আম-কাঁঠাল মাদার প্রভৃতি বড়ো বড়ো গাছের দ্বারা আবৃত ছিল, এইজন্য অনেকগুলি মানুষ একেবারে ভাসিয়া না গিয়া গাছে আটকাইয়া গিয়াছিল। কেহ-বা সমস্ত রাত্রি বন্যাবেগে দোদুল্যমান বাঁশঝাড়ে দুলিয়াছে, কেহ-বা মাদারের কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত, কেহ-বা উৎপাটিত বৃক্ষ-সমেত ভাসিয়া গেছে। জল সরিয়া গেলে জীবিত ব্যক্তিরা নামিয়া আসিয়া মৃতের মধ্যে বিচরণ করিয়া আত্মীয়দিগকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। অধিকাংশ মৃতদেহই অপরিচিত এবং ভিন্ন গ্রাম হইতে আগত। কেহই তাহাদিগকে সৎকার করিল না। পালে পালে শকুনি আসিয়া মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে লাগিল। শৃগাল-কুকুরের সহিত তাহাদের কোনো বিবাদ নাই কারণ শৃগাল-কুকুরও সমস্ত মরিয়া গিয়াছে। বারো-ঘর পাঠান গ্রামে বাস করিত; তাহারা অনেক উচ্চ জমিতে বাস করিত বলিয়া তাহাদের প্রায় কাহারও কোনো ক্ষতি হয় নাই। অবশিষ্ট জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা গৃহ পাইল তাহারা গৃহে আশ্রয় লইল, যাহারা পাইল না তাহারা আশ্রয়-অন্বেষণে অন্যত্র গেল। যাহারা বিদেশে ছিল

তাহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া নূতন গৃহ নির্মাণ করিল। ক্রমে অল্পে অল্পে পুনশ্চ লোকের বসতি আরম্ভ হইল। এই সময়ে মৃতদেহে পুষ্করিণীর জল দূষিত হইয়া এবং অন্যান্য নানা কারণে গ্রামে মড়ক আরম্ভ হইল। পাঠানদের পাড়ায় মড়কের প্রথম আরম্ভ হইল। মৃতদেহের গোর দিবার বা পরস্পরকে সেবা করিবার অবসর কাহারও রহিল না। হিন্দুরা কহিল, মুসলমানেরা গোহত্যা পাপের ফল ভোগ করিতেছে। জাতিবৈরিতায় এবং জাতিচ্যুতিভয়ে কোনো হিন্দু তাহাদিগকে জল দিল না বা কোনো-প্রকার সাহায্য করিল না। বিল্বন ঠাকুর যখন গ্রামে আসিলেন তখন গ্রামের এইরূপ অবস্থা। বিল্বনের কতকগুলি চেলা জুটিয়াছিল, মড়কের ভয়ে তাহারা পালাইবার চেষ্টা করিল। বিল্বন ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে বিরত করিলেন। তিনি পীড়িত পাঠানদিগকে সেবা করিতে লাগিলেন। তাহাদিগকে পথ্য পানীয় ঔষধ এবং তাহাদের মৃতদেহ গোর দিতে লাগিলেন। হিন্দুরা হিন্দু সন্ন্যাসীর অনাচার দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। বিল্বন কহিতেন, 'আমি সন্ন্যাসী, আমার কোনো জাত নাই। আমার জাত মানুষ। মানুষ যখন মরিতেছে তখন কিসের জাত? ভগবানের সৃষ্ট মানুষ যখন মানুষের প্রেম চাহিতেছে তখনই বা কিসের জাত?' হিন্দুরা বিল্বনের অনাসক্ত পরহিতৈষণা দেখিয়া তাঁহাকে ঘৃণা বা নিন্দা করিতে যেন সাহস করিল না। বিল্বনের কাজ ভালো কি মন্দ তাহারা স্থির করিতে পারিল না। তাহাদের অসম্পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞান সন্দিগ্ধভাবে বলিল 'ভালো নহে,' কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের ভিতরে যে মনুষ্য বাস করিতেছে সে বলিল 'ভালো'। যাহা হউক, বিল্বন অন্য লোকের ভালোমন্দর দিকে না তাকাইয়া কাজ করিতে লাগিলেন। মুমূর্ষু পাঠানেরা তাঁহাকে দেবতা জ্ঞান করিতে লাগিল। পাঠানের ছোটো ছোটো ছেলেদের তিনি মড়ক হইতে দূরে রাখিবার জন্য হিন্দুদের কাছে লইয়া গেলেন। হিন্দুরা বিষম শশব্যস্ত হইয়া উঠিল, কেহ তাহাদিগকে আশ্রয় দিল না। তখন

বিল্বন একটা বড়ো পরিত্যক্ত ভাঙা মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ছেলের পাল সেইখানে রাখিলেন। প্রাতে উঠিয়া বিল্বন তাঁহার ছেলেদের জন্য ভিক্ষা করিতে বাহির হইতেন। কিন্তু ভিক্ষা কে দিবে? দেশে শস্য কোথায়? অনাহারে কত লোক মরিবার উপক্রম করিতেছে। গ্রামের মুসলমান জমিদার অনেক দূরে বাস করিতেন। বিল্বন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। বহুকষ্টে তাঁহাকে রাজি করিয়া তিনি ঢাকা হইতে চাউল আমদানি করিতে লাগিলেন। তিনি পীড়িতদের সেবা করিতেন এবং তাঁহার চেলারা চাউল বিতরণ করিত। মাঝে মাঝে বিল্বন ছেলেদের সঙ্গে গিয়া খেলা করিতেন। তাহারা তাঁহাকে দেখিলে তুমুল কোলাহল উত্থাপন করিত— সন্ধ্যার সময় মন্দিরের পাশ দিয়া গেলে মনে হইত, যেন মন্দিরে সহস্র টিয়াপাখি বাসা করিয়াছে। বিল্বনের এস্রাজের আকারের একপ্রকার যন্ত্র ছিল; যখন অত্যন্ত শ্রান্ত হইতেন তখন তাহাই বাজাইয়া গান করিতেন। ছেলেগুলো তাঁহাকে ঘিরিয়া কেহ-বা গান শুনিত, কেহ-বা যন্ত্রের তার টানিত, কেহ-বা তাঁহার অনুকরণে গান করিবার চেষ্টা করিয়া বিষম চীৎকার করিত।

অবশেষে মড়ক মুসলমানপাড়া হইতে হিন্দুপাড়ায় আসিল। গ্রামে একপ্রকার অরাজকতা উপস্থিত হইল— চুরিডাকাতির শেষ নাই, যে যাহা পায় লুঠ করিয়া লয়। মুসলমানেরা দল বাঁধিয়া ডাকাতি আরম্ভ করিল। তাহারা পীড়িতদিগকে শয্যা হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া তক্তা-মাদুর বিছানা পর্যন্ত হরণ করিয়া লইয়া যাইত। বিল্বন প্রাণপণে তাহা-দিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বিল্বনের কথা তাহারা অত্যন্ত মান্য করিত, লঙ্ঘন করিতে সাহস করিত না। এইরূপে বিল্বন যথাসাধ্য গ্রামের শান্তি রক্ষা করিতেন।

একদিন সকালে বিল্বনের এক চেলা আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, একটি ছেলে সঙ্গে লইয়া একজন বিদেশী গ্রামের অশথতলায় আশ্রয়

লইয়াছে ; তাহাকে মড়কে ধরিয়াছে, বোধ করি সে আর বাঁচিবে না। বিল্বন দেখিলেন, কেদারেশ্বর অচেতন হইয়া পড়িয়া, ধ্রুব ধূলায় শুইয়া ঘুমাইয়া আছে। কেদারেশ্বরের মুমূর্ষু অবস্থা— পথকষ্টে এবং অনাহারে সে দুর্বল হইয়াছিল, এইজন্য পীড়া তাহাকে বলপূর্বক আক্রমণ করিয়াছে, কোনো ঔষধে কিছু ফল হইল না। সেই বৃক্ষতলেই তাহার মৃত্যু হইল। ধ্রুবকে দেখিয়া বোধ হইল যেন বহুক্ষণ অনাহারে ক্ষুধায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিল্বন অতি সাবধানে তাহাকে কোলে তুলিয়া তাঁহার শিশুশালায় লইয়া গেলেন।

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

চট্টগ্রাম এখন আরাকানের অধীন। গোবিন্দমাণিক্য নির্বাসিতভাবে চট্টগ্রামে আসিয়াছেন শুনিয়া আরাকানের রাজা মহাসমারোহপূর্বক তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। বলিয়া পাঠাইলেন, যদি সিংহাসন পুনরায় অধিকার করিতে চান তাহা হইলে আরাকান-পতি তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারেন।

গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, "না, আমি সিংহাসন চাই না।"

দূত কহিল, "তবে আরাকান-রাজসভায় পূজনীয় অতিথি হইয়া মহারাজ কিছুকাল বাস করুন।"

রাজা কহিলেন, "আমি রাজসভায় থাকিব না। চট্টগ্রামের এক পার্শ্বে আমাকে স্থান দান করিলে আমি আরাকান-রাজের নিকটে ঋণী হইয়া থাকিব।"

দূত কহিল, "মহারাজের যেখানে অভিরুচি সেইখানেই থাকিতে পারেন। এ-সমস্ত আপনারই রাজ্য মনে করিবেন।"

আরাকান-রাজের কতকগুলি অনুচর রাজার সঙ্গে সঙ্গেই রহিল। গোবিন্দমাণিক্য তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন না; তিনি মনে করিলেন,

হয়তো বা আরাকানপতি তাঁহাকে সন্দেহ করিয়া তাঁহার নিকট লোক রাখিতে ইচ্ছা করেন।

ময়ানি নদীর ধারে মহারাজ কুটির বাঁধিয়াছেন। স্বচ্ছসলিলা ক্ষুদ্র নদী ছোটো বড়ো শিলাখণ্ডের উপর দিয়া দ্রুত বেগে চলিয়াছে। দুই পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণের পাহাড় খাড়া হইয়া আছে, কালো পাথরের উপর বিচিত্র বর্ণের শৈবাল ঝুলিতেছে, মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো গহ্বর আছে, তাহার মধ্যে পাখি বাসা করিয়াছে। স্থানে স্থানে দুই পার্শ্বের পাহাড় এত উচ্চ যে, অনেক বিলম্বে সূর্যের দুই-একটি কর নদীর জলে আসিয়া পতিত হয়। বড়ো বড়ো গুল্ম বিবিধ আকারের পল্লব বিস্তার করিয়া পাহাড়ের গাত্রে ঝুলিতেছে। মাঝে মাঝে নদীর দুই তীরে ঘন জঙ্গলের বাহু অনেক দূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। একটা দীর্ঘ শাখাহীন শ্বেত গর্জনবৃক্ষ পাহাড়ের উপরে হেলিয়া রহিয়াছে, নীচে নদীর চঞ্চল জলে তাহার ছায়া নাচিতেছে, বড়ো বড়ো লতা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। ঘন সবুজ জঙ্গলের মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ শ্যামল কদলীবন। মাঝে মাঝে দুই তীর বিদীর্ণ করিয়া ছোটো ছোটো নির্ঝর শিশুদিগের ন্যায় আকুল বাহু, চঞ্চল আবেগ ও কলকল শুভ্রহাস্য লইয়া নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। নদী কিছুদূর সমভাবে গিয়া স্থানে স্থানে শিলাসোপান বাহিয়া ফেনাইয়া নিম্নাভিমুখে ঝরিয়া পড়িতেছে। সেই অবিশ্রাম ঝর্ঝর শব্দ নিস্তব্ধ শৈলপ্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এই ছায়াশীতল প্রবাহের স্নিগ্ধ ঝর্ঝর শব্দের মধ্যে স্তব্ধ শৈলতলে গোবিন্দমাণিক্য বাস করিতে লাগিলেন। হৃদয় বিস্তারিত করিয়া দিয়া হৃদয়ের মধ্যে শান্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন— নির্জন প্রকৃতির সান্ত্বনাময় গভীর প্রেম নানা দিক দিয়া সহস্র নির্ঝরের মতো তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে পড়িতে লাগিল। তিনি আপনার হৃদয়ের গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে ক্ষুদ্র অভিমান-সকল মুছিয়া ফেলিতে

লাগিলেন— দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া আপনার মধ্যে বিমল আলোক ও বায়ুর প্রবাহ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কে তাঁহাকে দুঃখ দিয়াছে, ব্যথা দিয়াছে, কে তাঁহার স্নেহের বিনিময় দেয় নাই, কে তাঁহার নিকট হইতে এক হস্তে উপকার গ্রহণ করিয়া অপর হস্তে কৃতঘ্নতা অর্পণ করিয়াছে, কে তাঁহার নিকট সমাদৃত হইয়া তাঁহাকে অপমান করিয়াছে, সমস্ত তিনি ভুলিয়া গেলেন। এই শৈলাসনবাসিনী অতি পুরাতন প্রকৃতির অবিশ্রাম কার্যশীলতা অথচ চিরনিশ্চিন্ত প্রশান্ত নবীনতা দেখিয়া তিনি নিজেও যেন সেইরূপ পুরাতন, সেইরূপ বৃহৎ, সেইরূপ প্রশান্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি যেন সুদূর জগৎ পর্যন্ত আপনার কামনাশূন্য স্নেহ বিস্তারিত করিয়া দিলেন— সমস্ত বাসনা দূর করিয়া দিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, 'হে ঈশ্বর, পতনোন্মুখ সম্পৎশিখর হইতে তোমার ক্রোড়ের মধ্যে ধারণ করিয়া আমাকে এ যাত্রা রক্ষা করিয়াছ। আমি মরিতে বসিয়াছিলাম, আমি বাঁচিয়া গিয়াছি। যখন রাজা হইয়াছিলাম তখন আমি আমার মহত্ত্ব জানিতাম না, আজ সমস্ত পৃথিবীময় আমার মহত্ত্ব অনুভব করিতেছি।' অবশেষে দুই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল; বলিলেন, 'মহারাজ, তুমি আমার স্নেহের ধ্রুবকে কাড়িয়া লইয়াছ, সে বেদনা এখনো হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ যায় নাই। আজ আমি বুঝিতেছি যে, তুমি ভালোই করিয়াছ। আমি সেই বালকের প্রতি স্বার্থপর স্নেহে আমার সমুদয় কর্তব্য, আমার জীবন বিসর্জন দিতেছিলাম। তুমি আমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ। আমি ধ্রুবকে আমার সমস্ত পুণ্যের পুরস্কার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম— তুমি তাহাকে কাড়িয়া লইয়া শিক্ষা দিতেছ যে, পুণ্যের পুরস্কার পুণ্য! তাই আজ সেই ধ্রুবের পবিত্র বিরহদুঃখকে সুখ বলিয়া, তোমার প্রসাদ বলিয়া, অনুভব করিতেছি। আমি বেতন লইয়া ভৃত্যের মতো কাজ করিব না প্রভু, আমি তোমার প্রেমের বশ হইয়া তোমার সেবা করিব।'

গোবিন্দমাণিক্য দেখিলেন, নির্জনে ধ্যানপরায়ণা প্রকৃতি যে স্নেহধারা সঞ্চয় করিতেছে সজনে লোকালয়ের মধ্যে তাহা নদীরূপে প্রেরণ করিতেছে— যে তাহা গ্রহণ করিতেছে তাহার তৃষ্ণানিবারণ হইতেছে, যে করিতেছে না তাহার প্রতিও প্রকৃতির কোনো অভিমান নাই। গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, 'আমিও আমার এই বিজনে-সঞ্চিত প্রেম সজনে বিতরণ করিতে বাহির হইব।' বলিয়া তাঁহার পর্বতাশ্রম ছাড়িয়া তিনি বাহির হইলেন।

সহসা রাজত্ব ছাড়িয়া দিয়া উদাসীন হওয়া, লেখায় যতটা সহজ মনে হয় বাস্তবিক ততটা সহজ নহে। রাজবেশ ছাড়িয়া দিয়া গেরুয়া বস্ত্র পরা নিতান্ত অল্প কথা নহে। বরঞ্চ রাজ্য পরিত্যাগ করা সহজ, কিন্তু আমাদের আজন্মকালের ছোটো ছোটো অভ্যাস আমরা অনায়াসে ছাড়িতে পারি না; তাহারা তাহাদের তীব্র ক্ষুধাতৃষ্ণা লইয়া আমাদের অস্থিমাংসের সহিত লিপ্ত হইয়া আছে, তাহাদিগকে নিয়মিত খোরাক না জোগাইলে তাহারা আমাদের রক্তশোষণ করিতে থাকে। কেহ যেন মনে না করেন যে গোবিন্দমাণিক্য যতদিন তাঁহার বিজন কুটিরে বাস করিতেছিলেন ততদিন কেবল অবিচলিত চিত্তে স্থাণুর মতো বসিয়া ছিলেন। তিনি পদে পদে আপনার সহস্র ক্ষুদ্র অভ্যাসের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। যখনই কিছুর অভাবে তাঁহার হৃদয় কাতর হইতেছিল তখনই তিনি তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার মনের সহস্রমুখী ক্ষুধাকে কিছু না খাইতে দিয়া বিনাশ করিতেছিলেন। পদে পদে এই শত শত অভাবের উপর জয়ী হইয়া তিনি সুখ লাভ করিতেছিলেন। যেমন দুরন্ত অশ্বকে দ্রুত বেগে ছুটাইয়া শান্ত করিতে হয়, তেমনি তিনি তাঁহার অভাবকাতর অশান্ত হৃদয়কে অভাবের মরুময় প্রান্তরের মধ্যে অবিশ্রাম দৌড় করাইয়া শান্ত করিতেছিলেন। অনেক দিন পর্যন্ত এক মুহূর্তও তাঁহার বিশ্রাম ছিল না।

পার্বত্য প্রদেশ ছাড়িয়া গোবিন্দমাণিক্য দক্ষিণে সমুদ্রাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। সমস্ত বাসনার দ্রব্য বিসর্জন দিয়া তিনি হৃদয়ের মধ্যে আশ্চর্য স্বাধীনতা অনুভব করিতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে আর বাঁধিতে পারে না, অগ্রসর হইবার সময় কেহ তাঁহাকে আর বাধা দিতে পারে না। প্রকৃতিকে অত্যন্ত বৃহৎ দেখিলেন এবং আপনাকেও তাহার সহিত এক বলিয়া মনে হইল। বৃক্ষলতার সে এক নূতন শ্যামল বর্ণ, সূর্যের সে এক নূতন কনককিরণ, প্রকৃতির সে এক নূতন মুখশ্রী দেখিতে লাগিলেন। গ্রামে গিয়া মানবের প্রত্যেক কাজের মধ্যে তিনি এক নূতন সৌন্দর্য দেখিতে লাগিলেন। মানবের হাস্যালাপ ওঠা-বসা চলা-ফেরার মধ্যে তিনি এক অপূর্ব নৃত্যগীতের মাধুরী দেখিতে পাইলেন।

যাহাকে দেখিলেন তাহাকে কাছে ডাকিয়া কথা কহিয়া সুখ পাইলেন— যে তাঁহাকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিল তাহার নিকট হইতে তাঁহার হৃদয় দূরে গমন করিল না। সর্বত্র দুর্বলকে সাহায্য করিতে এবং দুঃখীকে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, 'আমার নিজের সমস্ত বল এবং সমস্ত সুখ আমি পরের জন্য উৎসর্গ করিলাম, কেননা আমার নিজের কোনো কাজ নাই, কোনো বাসনা নাই।' সচরাচর যে-সকল দৃশ্য কাহারও চোখে পড়ে না তাহা নূতন আকার ধারণ করিয়া তাঁহার চোখে পড়িতে লাগিল। যখন দুই ছেলেকে পথে বসিয়া খেলা করিতে দেখিতেন— দুই ভাইকে, পিতাপুত্রকে, মাতা ও শিশুকে একত্র দেখিতেন— তাহারা ধূলিলিপ্ত হউক, দরিদ্র হউক, কদর্য হউক, তিনি তাহাদের মধ্যে দূরদূরান্তব্যাপী মানবহৃদয়সমুদ্রের অনন্ত গভীর প্রেম দেখিতে পাইতেন। একটি শিশুক্রোড়া জননীর মধ্যে তিনি যেন অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত মানবশিশুর জননীকে দেখিতে পাইতেন। দুই বন্ধুকে একত্র দেখিলেই তিনি সমস্ত মানবজাতিকে বন্ধু-প্রেমে সহায়বান অনুভব করিতেন। পূর্বে যে পৃথিবীকে মাঝে মাঝে

মাতৃহীনা বলিয়া বোধ হইত সেই পৃথিবীকে আনতনয়না চিরজাগ্রত-জননীর কোলে দেখিতে পাইলেন। পৃথিবীর দুঃখশোকদারিদ্র্য বিবাদ-বিদ্বেষ দেখিলেও তাঁহার মনে আর নৈরাশ্য জন্মিত না। একটিমাত্র মঙ্গলের চিহ্ন দেখিলেই তাঁহার আশা সহস্র অমঙ্গল ভেদ করিয়া স্বর্গাভিমুখে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত। আমাদের সকলের জীবনেই কি কোনো-না-কোনোদিন এমন এক অভূতপূর্ব নূতন প্রেম ও নূতন স্বাধীনতার প্রভাব উদিত হয় নাই যেদিন সহসা এই হাস্যক্রন্দনময় জগৎকে এক সুকোমল নবকুমারের মতো এক অপূর্ব সৌন্দর্য প্রেম ও মঙ্গলের ক্রোড়ে বিকশিত দেখিয়াছি— যেদিন কেহ আমাদিগকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না, কেহ আমাদিগকে জগতের কোনো সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না, কেহ আমাদিগকে কোনো প্রাচীরের মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না— যেদিন এক অপূর্ব বাঁশি বাজিয়া উঠে, এক অপূর্ব বসন্ত জাগিয়া উঠে, চরাচর চিরযৌবনের আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যায়— যেদিন সমস্ত দুঃখ-দারিদ্র্য-বিপদকে কিছুই মনে হয় না। নূতন স্বাধীনতার আনন্দে প্রসারিতহৃদয় গোবিন্দমাণিক্যের জীবনে সেইদিন উপস্থিত হইয়াছে।

দক্ষিণ চট্টগ্রামের রামু শহর এখনো দশ ক্রোশ দূরে। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে গোবিন্দমাণিক্য যখন আলমখাল-নামক ক্ষুদ্র গ্রামে গিয়া পৌঁছিলেন তখন গ্রামপ্রান্তবর্তী একটি কুটির হইতে ক্ষীণকণ্ঠ বালকের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয় সহসা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কুটিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, যুবক কুটিরস্বামী একটি শীর্ণ বালককে কোলে করিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছে। বালক থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে এবং থাকিয়া থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদিতেছে। কুটিরস্বামী তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। সন্ন্যাসবেশী গোবিন্দমাণিক্যকে দেখিয়া সে শশব্যস্ত হইয়া পড়িল। কাতর

স্বরে কহিল, "ঠাকুর, ইহাকে আশীর্বাদ করো।" গোবিন্দমাণিক্য আপনার কম্বল বাহির করিয়া কম্পমান বালকের চারি দিকে জড়াইয়া দিলেন। বালক একবার কেবল তাহার শীর্ণ মুখ তুলিয়া গোবিন্দমাণিক্যের দিকে চাহিল। তাহার চোখের নীচে কালী পড়িয়াছে; তাহার ক্ষীণ মুখের মধ্যে দুখানি চোখ ছাড়া আর কিছু নাই যেন। একবার গোবিন্দ-মাণিক্যকে দেখিয়াই দুইখানি পাণ্ডুবর্ণ পাৎলা ঠোঁট নাড়িয়া ক্ষীণ অব্যক্ত শব্দ করিল। আবার তখনই তাহার পিতার স্কন্ধের উপর মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার পিতা তাহাকে কম্বল-সমেত ভূমিতে রাখিয়া রাজাকে প্রণাম করিল এবং রাজার পদধূলি লইয়া ছেলের গায়ে মাথায় দিল। রাজা ছেলেকে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটির বাপের নাম কী?" কুটিরস্বামী কহিল, "আমি ইহার বাপ, আমার নাম যাদব। ভগবান একে একে আমার সকল ক'টিকে লইয়াছেন, কেবল এইটি এখনো বাকি আছে।" বলিয়া গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। রাজা কুটিরস্বামীকে বলিলেন, "আজ রাত্রে আমি তোমার এখানে অতিথি। আমি কিছুই খাব না, অতএব আমার জন্য আহারাদির উদ্যোগ করিতে হইবে না। কেবল এখানে রাত্রি যাপন করিব। বলিয়া সে রাত্রি সেইখানে রহিলেন। অনুচরগণ গ্রামের এক ধনী কায়স্থের বাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। নিকটে একটা পানাপুকুর ছিল, তাহার উপর হইতে বাষ্প উঠিতে লাগিল। গোয়াল ঘর হইতে খড় এবং শুষ্ক পত্র জ্বালানোর গুরুভার ধোঁয়া আকাশে উঠিতে পারিল না, গুঁড়ি মারিয়া সম্মুখে বিস্তৃত জলা মাঠকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল। আস্‌শেওড়ার বেড়ার কাছ হইতে কর্কশ স্বরে ঝিঁঝিঁ ডাকিতে লাগিল। বাতাস একেবারে বন্ধ, গাছের পাতাটি নড়িতেছে না। পুকুরের অপর পাড়ে ঘন বাঁশঝাড়ের মধ্য হইতে একটা পাখি থাকিয়া থাকিয়া টি টি করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে। ক্ষীণালোকে গোবিন্দমাণিক্য

সেই রুগ্ণ বালকের বিবর্ণ শীর্ণ মুখ দেখিতেছেন। তিনি তাহাকে ভালো রূপ কম্বলে আবৃত করিয়া তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে নানাবিধ গল্প শুনাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইল, দূরে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। বালক গল্প শুনিতে শুনিতে রোগের কষ্ট ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। রাজা তাহার পার্শ্বের ঘরে আসিয়া শয়ন করিলেন। রাত্রে তাঁহার ঘুম হইল না। কেবল ধ্রুবকে মনে পড়িতে লাগিল। রাজা কহিলেন, 'ধ্রুবকে হারাইয়া সকল বালককেই আমার ধ্রুব বলিয়া বোধ হয়।'

খানিক রাত্রে শুনিলেন পাশের ঘরে ছেলেটি জাগিয়া উঠিয়া তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে' "বাবা, ও কী বাজে।"

বাপ কহিলেন, "বাঁশি বাজিতেছে।"

ছেলে। বাঁশি কেন বাজে?

বাপ। কাল যে পূজা, বাপ আমার!

ছেলে। কাল পূজা? পূজার দিন আমাকে কিছু দেবে না?

বাপ। কী দেব বাবা?

ছেলে। আমাকে একটা রাঙা শাল দেবে না?

বাপ। আমি শাল কোথায় পাব? আমার যে কিছু নেই, মানিক আমার!

ছেলে। বাবা, তোমার কিছু নেই বাবা?

বাপ। কিছু নেই বাবা, কেবল তুমি আছ।

ভগ্নহৃদয় পিতার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পাশের ঘর হইতে শুনা গেল।

ছেলে আর কিছু বলিল না। বোধ করি বাপকে জড়াইয়া ধরিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি শেষ না হইতে হইতেই গোবিন্দমাণিক্য গৃহস্বামীর নিকট বিদায় না লইয়াই অশ্বারোহণে রামু শহরের অভিমুখে চলিয়া গেলেন। আহার করিলেন না, বিশ্রাম করিলেন না। পথের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নদী

ছিল, ঘোড়াসুদ্ধ নদী পার হইলেন। প্রখর রৌদ্রের সময় রামুতে গিয়া পৌঁছিলেন; সেখানে অধিক বিলম্ব করিলেন না। আবার সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই যাদবের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাদবকে আড়ালে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহার ঝুলির মধ্য হইতে একখানি লাল শাল বাহির করিয়া যাদবের হাতে দিয়া কহিলেন, "আজ পূজার দিনে এই শালটি তোমার ছেলেকে দাও।"

যাদব কাঁদিয়া গোবিন্দমাণিক্যের পা জড়াইয়া ধরিল। কহিল, "প্রভু, তুমি আনিয়াছ, তুমিই দাও।"

রাজা কহিলেন, "না, আমি দিব না, তুমি দাও। আমি দিলে কোনো ফল নাই। আমার নাম করিয়ো না। আমি কেবল তোমার ছেলের মুখে আনন্দের হাসি দেখিয়া চলিয়া যাইব।"

রুগ্ণ বালকের অতি শীর্ণ ম্লান মুখ প্রফুল্ল দেখিয়া রাজা চলিয়া গেলেন। রাজা বিষণ্ণ হইয়া মনে মনে কহিলেন, 'আমি কোনো কাজ করিতে পারি না। আমি কেবল কয়টা বৎসর রাজত্বই করিয়াছি, কিছুই শিক্ষা করি নাই। কী করিলে একটি ক্ষুদ্র বালকের রোগের কষ্ট একটু নিবারণ হইবে তাহা জানি না। আমি কেবল অসহায় অকর্মণ্য ভাবে শোক করিতে জানি। বিল্বন ঠাকুর যদি থাকিতেন তো ইহাদের কিছু উপকার করিয়া যাইতেন। আমি যদি বিল্বন ঠাকুরের মতো হইতাম!'

গোবিন্দমাণিক্য বলিলেন, 'আমি আর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইব না, লোকালয়ের মধ্যে বাস করিয়া কাজ করিতে শিখিব।'

রামুর দক্ষিণে রাজকুলের নিকটে মগদিগের যে দুর্গআছে আরাকান-রাজের অনুমতি লইয়া সেইখানে তিনি বাস করিতে লাগিলেন।

গ্রামবাসীদের যতগুলো ছেলেপিলে ছিল সকলেই দুর্গে গোবিন্দ-মাণিক্যের নিকট আসিয়া জুটিল। গোবিন্দমাণিক্য তাহাদিগকে লইয়া

একটা বড়ো পাঠশালা খুলিলেন। তিনি তাহাদিগকে পড়াইতেন, তাহাদের সহিত খেলিতেন, তাহাদের বাড়িতে গিয়া তাহাদের সহিত বাস করিতেন, পীড়া হইলে তাহাদিগকে দেখিতে যাইতেন। ছেলেরা সাধারণতঃ যে নিতান্তই স্বর্গ হইতে আসিয়াছে এবং তাহারা যে দেবশিশু, তাহা নহে— তাহাদের মধ্যে মানব এবং দানব ভাবের কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই। স্বার্থপরতা ক্রোধ লোভ দ্বেষ হিংসা তাহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ বলবান, তাহার উপরে আবার বাড়িতে পিতামাতার নিকট হইতেও সকল সময় ভালো শিক্ষা পায় যে তাহা নহে। এইজন্য মগের দুর্গে মগের রাজত্ব হইয়া উঠিল— দুর্গের মধ্যে যেন উনপঞ্চাশ বায়ু এবং চৌষট্টি ভূতে একত্র বাসা করিয়াছে। গোবিন্দমাণিক্য এই সকল উপকরণ লইয়া ধৈর্য ধরিয়া মানুষ গড়িতে লাগিলেন। একটি মানুষের জীবন যে কত মহৎ ও কী প্রাণপণ যত্নে পালন ও রক্ষা করিবার দ্রব্য তাহা গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয়ে সর্বদা জাগরূক। তাঁহার চারি দিকে অনন্তফলপরিপূর্ণ মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়, ইহাই দেখিয়া এবং নিজের চেষ্টায় ইহাই সাধন করিয়া গোবিন্দমাণিক্য নিজের অসম্পূর্ণ জীবন বিসর্জন করিতে চান। ইহার জন্য তিনি সকল কষ্ট সকল উপদ্রব সহ্য করিতে পারেন। কেবল মাঝে মাঝে এক-একবার হতাশ্বাস হইয়া দুঃখ করিতেন, 'আমার কার্য আমি নিপুণরূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেছি না। বিল্বন থাকিলে ভালো হইত।'

এইরূপে গোবিন্দমাণিক্য একশত ধ্রুবকে লইয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

স্টুয়ার্টকৃত বাংলার ইতিহাস হইতে এই পরিচ্ছেদ সংগৃহীত

এ দিকে শা সুজা তাঁহার ভ্রাতা ঔরংজীবের সৈন্য কর্তৃক তাড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছেন। এলাহাবাদের নিকট যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার পরাজয় হয়। বিপক্ষ পরাক্রান্ত, এবং বিপদের সময় সুজা স্বপক্ষীয়দেরও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি অপমানিত ও ভীত ভাবে ছদ্মবেশে সামান্য লোকের মতো একাকী পলায়ন করিতে লাগিলেন। যেখানেই যান পশ্চাতে শত্রুসৈন্যের ধূলিধ্বজা ও তাহাদের অশ্বের ক্ষুরধ্বনি তাঁহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। অবশেষে পাটনায় পৌঁছিয়া তিনি পুনর্বার নবাব-বেশে আপন পরিবার ও প্রজাদের নিকটে আগমন সংবাদ ঘোষণা করিলেন। তিনিও যেমন পাটনায় পৌঁছিয়াছেন তাহার কিছুকাল পরেই ঔরংজীবের পুত্র কুমার মহম্মদ সৈন্য-সহিত পাটনার দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। সুজা পাটনা ছাড়িয়া মুঙ্গেরে পালাইলেন।

মুঙ্গেরে তাঁহার বিক্ষিপ্ত দলবল কতক কতক তাঁহার নিকট আসিয়া জুটিল এবং সেখানে তিনি নূতন সৈন্যও সংগ্রহ করিলেন। তেরিয়াগাড় ও শিকৃলিগলির দুর্গ সংস্কার করিয়া এবং নদীতীরে পাহাড়ের উপরে প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দৃঢ় হইয়া বসিলেন।

এ দিকে ঔংরজীব তাঁহার বিচক্ষণ সেনাপতি মীরজুম্‌লাকে কুমার মহম্মদের সাহায্যে পাঠাইলেন। কুমার মহম্মদ প্রকাশ্যভাবে মুঙ্গেরের দুর্গের অনতিদূরে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন এবং মীরজুম্‌লা অন্য গোপন পথ দিয়া মুঙ্গের-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যখন সুজা কুমার মহম্মদের সহিত ছোটোখাটো যুদ্ধে ব্যাপৃত আছেন এমন সময় সহসা সংবাদ পাইলেন যে, মীরজুম্‌লা বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া বসন্তপুরে আসিয়া

পৌঁছিয়াছেন। সুজা ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া মুঙ্গের ছাড়িয়া রাজমহলে পলায়ন করিলেন। সেইখানেই তাঁহার সমস্ত পরিবার বাস করিতেছিল। সম্রাট্‌-সৈন্য অবিলম্বে সেখানেও তাঁহার অনুসরণ করিল। সুজা ছয় দিন ধরিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া শত্রুসৈন্যকে অগ্রসর হইতে দিলেন না। কিন্তু যখন দেখিলেন আর রক্ষা হয় না তখন একদিন অন্ধকার ঝড়ের রাত্রে তাঁহার পরিবারসকল ও যথাসম্ভব ধনসম্পত্তি লইয়া নদী পার হইয়া তোণ্ডায় পলায়ন করিলেন, এবং অবিলম্বে সেখানকার দুর্গ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে ঘনবর্ষা আসিল, নদী অত্যন্ত স্ফীত এবং পথ দুর্গম হইয়া উঠিল। সম্রাট্‌-সৈন্যেরা অগ্রসর হইতে পারিল না।

এই যুদ্ধবিগ্রহের পূর্বে কুমার মহম্মদের সহিত সুজার কন্যার বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়াছিল। কিন্তু, এই যুদ্ধের উপদ্রবে সে প্রস্তাব উভয় পক্ষই বিস্মৃত হইয়াছিল।

বর্ষায় যখন যুদ্ধ স্থগিত আছে এবং মীরজুম্‌লা রাজমহল হইতে কিছু দূরে তাঁহার শিবির লইয়া গেছেন, এমন সময় সুজার একজন সৈনিক তোণ্ডার শিবির হইতে আসিয়া গোপনে কুমার মহম্মদের হস্তে একখানি পত্র দিল। কুমার খুলিয়া দেখিলেন সুজার কন্যা লিখিতেছেন, 'কুমার, এই কি আমার অদৃষ্টে ছিল! যাঁহাকে মনে মনে স্বামিরূপে বরণ করিয়া আমার সমগ্র হৃদয় সমর্পণ করিয়াছি, যিনি অঙ্গুরীয়বিনিময় করিয়া আমাকে গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তিনি আজ নিষ্ঠুর তরবারি হস্তে আমার পিতার প্রাণ লইতে আসিয়াছেন, এই কি আমাকে দেখিতে হইল! কুমার, এই কি আমাদের বিবাহ-উৎসব! তাই কি এত সমারোহ! তাই কি আমাদের রাজমহল আজ রক্তবর্ণ! তাই কি কুমার দিল্লি হইতে লোহার শৃঙ্খল হাতে করিয়া আনিয়াছেন! এই কি প্রেমের শৃঙ্খল!'

এই পত্র পড়িয়া সহসা প্রবল ভূমিকম্পে যেন কুমার মহম্মদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল ! তিনি এক মুহূর্ত আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ সাম্রাজ্যের আশা, বাদশাহের অনুগ্রহ, সমস্ত তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন। প্রথম যৌবনের দীপ্ত হুতাশনে তিনি ক্ষতিলাভের বিবেচনা সমস্ত বিসর্জন করিলেন। তাঁহার পিতার সমস্ত কার্য তাঁহার অত্যন্ত অন্যায় ও নিষ্ঠুর বলিয়া বোধ হইল। পিতার ষড়্‌যন্ত্রপ্রবণ নিষ্ঠুর নীতির বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে তিনি পিতার সমক্ষেই আপন মত স্পষ্ট ব্যক্ত করিতেন এবং কখনো কখনো তিনি সম্রাটের বিরাগভাজন হইতেন। আজ তিনি তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে ডাকিয়া সম্রাটের নিষ্ঠুরতা খলতা ও অত্যাচার সম্বন্ধে বিরাগ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "আমি তোণ্ডায় আমার পিতৃব্যের সহিত যোগ দিতে যাইব। তোমরা যাহারা আমাকে ভালোবাস আমার অনুবর্তী হও।" তাহারা দীর্ঘ সেলাম করিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল, "শাহজাদা যাহা বলিতেছেন তাহা অতি যথার্থ, কালই দেখিবেন অর্ধেক সৈন্য তোণ্ডার শিবিরে শাহজাদার সহিত মিলিত হইবে।" মহম্মদ সেই দিনই নদী পার হইয়া সুজার শিবিরে উপস্থিত হইলেন।

তোণ্ডায় উৎসব পড়িয়া গেল। যুদ্ধবিগ্রহের কথা সকলে একেবারেই ভুলিয়া গেল। এতদিন কেবল পুরুষেরাই ব্যস্ত ছিল, এখন সুজার পরিবারে রমণীদের হাতে কাজের অন্ত রহিল না। সুজা অত্যন্ত স্নেহ ও আনন্দের সহিত মহম্মদকে গ্রহণ করিলেন। অবিশ্রাম রক্তপাতের পরে রক্তের টান যেন আরও বাড়িয়া উঠিল, নৃত্যগীতবাদ্যের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। নৃত্যগীত শেষ হইতে না হইতেই সংবাদ আসিল সম্রাট্‌-সৈন্য নিকটবর্তী হইয়াছে।

মহম্মদ যেমনি সুজার শিবিরে গেছেন সৈন্যরা অমনি মীরজুম্‌লার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল। একটি সৈন্যও মহম্মদের সহিত যোগ দিল

না ; তাহারা বুঝিয়াছিল, মহম্মদ ইচ্ছাপূর্বক বিপদ্‌সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন, সেখানে তাঁহার দলভুক্ত হইতে যাওয়া বাতুলতা।

সুজা এবং মহম্মদের বিশ্বাস ছিল যে, সম্রাট্‌-সৈন্যেরা অধিকাংশই যুদ্ধক্ষেত্রে কুমার মহম্মদের সহিত যোগ দিবে। এই আশায় মহম্মদ নিজের নিশান উড়াইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বৃহৎ এক দল সম্রাট্‌-সৈন্য তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল। মহম্মদ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। নিকটে আসিয়াই তাহারা মহম্মদের সৈন্যদলের উপর গোলা বর্ষণ করিল। তখন মহম্মদ সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তখন আর সময় নাই। সৈন্যেরা পলায়নতৎপর হইল। সুজার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুদ্ধে মারা পড়িল।

সেই রাত্রেই হতভাগা সুজা এবং তাহার জামাতা সপরিবারে দ্রুত-গামী নৌকায় চড়িয়া ঢাকায় পলায়ন করিলেন। মীরজুম্‌লা ঢাকায় সুজার অনুসরণ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। তিনি বিজিত দেশে শৃঙ্খলাস্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন।

দুর্দশার দিনে, বিপদের সময়, যখন বন্ধুরা একে একে বিমুখ হইতে থাকে তখন মহম্মদ ধন প্রাণ মান তুচ্ছ করিয়া সুজার পক্ষাবলম্বন করাতে সুজার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি প্রাণের সহিত মহম্মদকে ভালোবাসিলেন। এমন সময়ে ঢাকা সহরে ঔরঙ্গজীবের একজন পত্রবাহক চর ধরা পড়িল। সুজার হাতে তাহার পত্র গিয়া পড়িল। ঔরংজীব মহম্মদকে লিখিতেছেন, 'প্রিয়তম পুত্র মহম্মদ, তুমি তোমার কর্তব্য অবহেলা করিয়া পিতৃবিদ্রোহী হইয়াছ, এবং তোমার অকলঙ্ক যশে কলঙ্ক নিক্ষেপ করিয়াছ। রমণীর ছলনাময় হাস্যে মুগ্ধ হইয়া আপন ধর্ম বিসর্জন দিয়াছ। ভবিষ্যতে সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য শাসনের ভার যাহার হস্তে তিনি আজ এক রমণীর দাস হইয়া আছেন। যাহা হউক, ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া মহম্মদ যখন অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন তখন তাঁহাকে মাপ

করিলাম। কিন্তু যে কার্যের জন্য গিয়াছেন সেই কার্য সাধন করিয়া আসিলে তবে তিনি আমাদের অনুগ্রহের অধিকারী হইবেন।'

সুজা এই পত্র পাঠ করিয়া বজ্রাহত হইলেন। মহম্মদ বারবার করিয়া বলিলেন, তিনি কখনোই পিতার নিকটে অনুতাপ প্রকাশ করেন নাই। এ সমস্ত তাঁহার পিতার কৌশল। কিন্তু, সুজার সন্দেহ দূর হইল না। সুজা তিনদিন ধরিয়া চিন্তা করিলেন। অবশেষে চতুর্থ দিনে কহিলেন, "বৎস, আমাদের মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধন শিথিল হইয়াছে। অতএব আমি অনুরোধ করিতেছি, তুমি তোমার স্ত্রীকে লইয়া প্রস্থান করো, নহিলে আমাদের মনে আর শান্তি থাকিবে না। আমার রাজ-কোষের দ্বার মুক্ত করিয়া দিলাম, শ্বশুরের উপহার-স্বরূপ যত ইচ্ছা ধনরত্ন লইয়া যাও।"

মহম্মদ অশ্রুবিসর্জন করিয়া বিদায় হইলেন, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সঙ্গে গেলেন।

সুজা কহিলেন, 'আর যুদ্ধ করিব না। চট্টগ্রামের বন্দর হইতে জাহাজ লইয়া মক্কায় চলিয়া যাইব।' বলিয়া ঢাকা ছাড়িয়া ছদ্মবেশে চলিয়া গেলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

যে দুর্গে গোবিন্দমাণিক্য বাস করিতেন একদিন বর্ষার অপরাহ্নে সেই দুর্গের পথে একজন ফকির সঙ্গে তিন জন বালক ও একজন প্রাপ্তবয়স্ক তল্পিদার লইয়া চলিয়াছেন। বালকদের অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাইতেছে। বাতাস বেগে বহিতেছে এবং অবিশ্রাম বর্ষার ধারা পড়িতেছে। সকলের চেয়ে ছোটো বালকটির বয়স চৌদ্দর অধিক হইবে না; সে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে কাতর স্বরে কহিল, "পিতা, আর তো পারি না।" বলিয়া অধীর ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

ফকির কিছু না বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন।

বড়ো বালকটি ছোটোকে তিরস্কার করিয়া কহিল, "পথের মধ্যে এমন করিয়া কাঁদিয়া ফল কী! চুপ কর্। অনর্থক পিতাকে কাতর করিস নে।"

ছোটো বালকটি তখন তাহার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন দমন করিয়া শান্ত হইল।

মধ্যম বালকটি ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিল, "পিতা, আমরা কোথায় যাইতেছি।"

ফকির কহিলেন, "ওই-যে দুর্গের চূড়া দেখা যাইতেছে ওই দুর্গে যাইতেছি।"

"ওখানে কে আছে, পিতা?"

"শুনিয়াছি, কোথাকার একজন রাজা সন্ন্যাসী হইয়া ওখানে বাস করেন।"

"রাজা সন্ন্যাসী কেন হইল পিতা?"

ফকির কহিলেন, "জানি না বাছা। হয়তো তাঁহার আপনার সহোদর ভ্রাতা সৈন্য হইয়া তাঁহাকে একটা গ্রাম্য কুকুরের মতো দেশ হইতে দেশান্তরে তাড়া করিয়াছে। রাজ্য ও সুখসম্পৎ হইতে তাঁহাকে পথে বাহির করিয়া দিয়াছে। এখন হয়তো কেবল দারিদ্র্যের অন্ধকার ক্ষুদ্র গহ্বর ও সন্ন্যাসীর গেরুয়াবসন পৃথিবীর মধ্যে তাঁহার একমাত্র লুকাইবার স্থান। আপনার ভ্রাতার বিদ্বেষ হইতে, বিষদন্ত হইতে, আর কোথাও রক্ষা নাই।" বলিয়া ফকির দৃঢ়রূপে আপন ওষ্ঠাধর চাপিয়া হৃদয়ের আবেগ দমন করিলেন।

বড়ো ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল, "পিতা, এই সন্ন্যাসী কোন্ দেশের রাজা ছিল?"

ফকির কহিলেন, "তাহা জানি না বাছা।"

"যদি আমাদের আশ্রয় না দেয় ?"

"তবে আমরা বৃক্ষতলে শয়ন করিব।— আর আমাদের স্থান কোথায় ?"

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দুর্গে সন্ন্যাসী ও ফকিরে দেখা হইল। উভয়েই উভয়কে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। গোবিন্দমাণিক্য চাহিয়া দেখিলেন, ফকিরকে ফকির বলিয়া বোধ হইল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থপর বাসনা হইতে হৃদয়কে প্রত্যাহরণ করিয়া একমাত্র বৃহৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে স্থাপন করিলে মুখে যে একপ্রকার জ্বালাবিহীন বিমল জ্যোতি প্রকাশ পায় ফকিরের মুখে তাহা দেখিতে পাইলেন না। ফকির সর্বদা সতর্ক সচকিত। তাঁহার হৃদয়ের তৃষিত বাসনাসকল তাঁহার দুই জলন্ত নেত্র হইতে যেন অগ্নিপান করিতেছে। অধীর হিংসা তাঁহার দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর এবং দৃঢ়লগ্ন দন্তের মধ্যে বিফলে প্রতিহত হইয়া পুনরায় যেন হৃদয়ের অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করিয়া আপনাকে আপনি দংশন করিতেছে। সঙ্গে তিনজন বালক ; তাহাদের অত্যন্ত সুকুমার সুন্দর শ্রান্ত ক্লিষ্ট দেহ ও একপ্রকার গর্বিত সংকোচ দেখিয়া মনে হইল, যেন তাহারা আজন্মকাল অতি সযত্নে সম্মানের সিকার উপরে তোলা ছিল, এই প্রথম তাহাদের ভূমিতলে পদার্পণ। চলিতে গেলে যে চরণের অঙ্গুলিতে ধূলি লাগে, ইহা যেন পূর্বে তাহাদের প্রত্যক্ষ জানা ছিল না। পৃথিবীর এই ধূলিময় মলিন দারিদ্র্যে প্রতি পদে যেন পৃথিবীর উপরে তাহাদের ঘৃণা জন্মিতেছে, মছলন্দ ও মাটির প্রভেদ দেখিয়া প্রতি পদে তাহারা যেন পৃথিবীকে তিরস্কার করিতেছে। পৃথিবী যেন তাহাদেরই প্রতি বিশেষ আড়ি করিয়া আপনার বড়ো মছলন্দখানা গুটাইয়া রাখিয়াছে। সকলেই যেন তাহাদের নিকটে অপরাধ করিতেছে। দরিদ্র যে ভিক্ষা করিবার জন্য তাহার মলিনবসন লইয়া তাহাদের কাছে ঘেঁষিতে সাহস করিতেছে

এ কেবল তাহার স্পর্ধা ; ঘৃণ্য কুকুর পাছে কাছে আসে এইজন্য লোকে যেমন খাদ্যখণ্ড দূর হইতে ছুঁড়িয়া দেয় ইহারাও যেন তেমনি ক্ষুধার্ত মলিন ভিক্ষুককে দেখিলে দূর হইতে মুখ ফিরাইয়া এক মুঠা মুদ্রা অনায়াসে ফেলিয়া দিতে পারে। তাহাদের চক্ষে অধিকাংশ পৃথিবীর একপ্রকার যৎসামান্য ভাব ও ছিন্নবস্ত্র অকিঞ্চনতা যেন কেবল একটা মস্ত বেয়াদবি। তাহারা যে পৃথিবীতে সুখী ও সম্মানিত হইতেছে না, এ কেবল পৃথিবীর দোষ।

গোবিন্দমাণিক্য যে ঠিক এতটা ভাবিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি লক্ষণ দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, এই ফকির, এ যে আপনার বাসনাসকল বিসর্জন দিয়া স্বাধীন ও সুস্থ হইয়া জগতের কাজ করিতে বাহির হইয়াছে তাহা নহে, এ কেবল আপনার বাসনা তৃপ্ত হয় নাই বলিয়া রাগ করিয়া সমস্ত জগতের প্রতি বিমুখ হইয়া বাহির হইয়াছে। তিনি যাহা চান তাহাই তাঁহার পাওনা এইরূপ ফকিরের বিশ্বাস— এবং জগৎ তাহার নিকটে যাহা চায় তাহা সুবিধামত দিলেই চলিবে এবং না দিলেও কোনো ক্ষতি নাই। ঠিক এই বিশ্বাস-অনুসারে কাজ হয় নাই বলিয়া তিনি জগৎকে এক-ঘরে করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।

গোবিন্দমাণিক্যকে দেখিয়া ফকিরের রাজা বলিয়াও মনে হইল, সন্ন্যাসী বলিয়াও বোধ হইল। তিনি ঠিক এরূপ আশা করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, হয় একটা লম্বোদর পাগড়ি-পরা স্ফীত মাংসপিণ্ড দেখিবেন, নয়তো একটা দীনবেশধারী মলিন সন্ন্যাসী, অর্থাৎ ভস্মাচ্ছাদিত ধূলিশয্যাশায়ী উদ্ধত স্পর্ধা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু দুয়ের মধ্যে কোনোটাই দেখিতে পাইলেন না। গোবিন্দমাণিক্যকে দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন, তবু যেন সমস্তই তাঁহারই। তিনি কিছুই চান না বলিয়াই যেন পাইয়াছেন, তিনি আপনাকে দিয়াছেন বলিয়া পাইয়াছেন। তিনি যেমন আত্মসমর্পণ

করিয়াছেন তেমনি সমস্ত জগৎ আপন ইচ্ছায় তাঁহার নিকটে ধরা দিয়াছে। কোনোপ্রকার আড়ম্বর নাই বলিয়া তিনি রাজা, এবং সমস্ত সংসারের নিতান্ত নিকটবর্তী হইয়াছেন বলিয়া তিনি সন্ন্যাসী। এইজন্য তাঁহাকে রাজাও সাজিতে হয় নাই, সন্ন্যাসীও সাজিতে হয় নাই।'

রাজা তাঁহার অতিথিদিগকে সযত্নে সেবা করিলেন। তাঁহারা তাঁহার সেবা পরম অবহেলার সহিত গ্রহণ করিলেন। ইহাতে যেন তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। তাঁহাদের আরামের জন্য কী কী দ্রব্য আবশ্যক তাহাও রাজাকে জানাইয়া দিলেন। রাজা বড়ো ছেলেটিকে স্নেহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "পথশ্রমে অত্যন্ত শ্রান্তিবোধ হইয়াছে কি ?"

বালক তাহার ভালোরূপ উত্তর না দিয়া ফকিরের কাছে ঘেঁষিয়া বসিল। রাজা তাহাদের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "তোমাদের এই সুকুমার শরীর তো পথে চলিবার জন্য নহে। তোমরা আমার এই দুর্গে বাস করো, আমি তোমাদিগকে যত্ন করিয়া রাখিব।"

রাজার এই কথার উত্তর দেওয়া উচিত কি না এবং এই-সকল লোকদের সহিত ঠিক কিরূপ ভাবে ব্যবহার করা কর্তব্য তাহা বালকেরা ভাবিয়া পাইল না—তাহারা ফকিরের অধিকতর কাছে ঘেঁষিয়া বসিল; যেন মনে করিল, কোথাকার এই ব্যক্তি মলিন হাত বাড়াইয়া তাহাদিগকে এখনই আত্মসাৎ করিতে আসিতেছে।

ফকির গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আমরা কিছুকাল তোমার এই দুর্গে বাস করিতে পারি।" রাজাকে যেন অনুগ্রহ করিলেন। মনে মনে কহিলেন, 'আমি কে তাহা যদি জানিতে, তবে এই অনুগ্রহে তোমার আর আনন্দের সীমা থাকিত না।'

তিনটি বালককে রাজা কিছুতেই পোষ মানাইতে পারিলেন না। এবং ফকির নিতান্ত যেন নির্লিপ্ত হইয়া রহিলেন।

ফকির গোবিন্দমাণিক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনিয়াছি তুমি এক কালে রাজা ছিলে, কোথাকার রাজা?"

গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, "ত্রিপুরার।"

শুনিয়া বালকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ছোটো বিবেচনা করিল। তাহারা কোনো কালে ত্রিপুরার নাম শুনে নাই। কিন্তু ফকির ঈষৎ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার রাজত্ব গেল কী করিয়া?"

গোবিন্দমাণিক্য কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "বাংলার নবাব শা সুজা আমাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছেন।" নক্ষত্ররায়ের কোনো কথা বলিলেন না।

এই কথা শুনিয়া বালকেরা সকলে চমকিয়া উঠিয়া ফকিরের মুখের দিকে চাহিল। ফকিরের মুখ যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি সহসা বলিয়া ফেলিলেন, "এ-সকল বুঝি তোমার ভাইয়ের কাজ? তোমার ভাই বুঝি তোমাকে রাজ্য হইতে তাড়া করিয়া সন্ন্যাসী করিয়াছে?"

রাজা আশ্চর্য হইয়া গেলেন; কহিলেন, "তুমি এত সংবাদ কোথায় পাইলে সাহেব?" পরে মনে করিলেন, আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই, কাহারও নিকট হইতে শুনিয়া থাকিবেন।

ফকির তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আমি কিছুই জানি না। আমি কেবল অনুমান করিতেছি।"

রাত্রি হইলে সকলে শয়ন করিতে গেলেন। সে রাত্রে ফকিরের আর ঘুম হইল না। জাগিয়া দুঃস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক শব্দে চমকিয়া উঠিলেন।

পরদিন ফকির গোবিন্দমাণিক্যকে কহিলেন, "বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ এখানে আর থাকা হইল না; আমরা আজ বিদায় হই।"

গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, "বালকেরা পথের কষ্টে শ্রান্ত হইয়া

পড়িয়াছে, উহাদিগকে আর-কিছুকাল বিশ্রাম করিতে দিলে ভালো হয়।”

বালকেরা কিছু বিরক্ত হইল ; তাহাদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠটি ফকিরের দিকে চাহিয়া কহিল, “আমরা কিছু নিতান্ত শিশু না, যখন আবশ্যক তখন অনায়াসে কষ্ট সহ্য করিতে পারি।” গোবিন্দমাণিক্যের নিকট হইতে তাহারা স্নেহ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে। গোবিন্দমাণিক্য আর কিছু বলিলেন না।

ফকির যখন যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় দুর্গে আর-একজন অতিথি আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা ও ফকির উভয়ে আশ্চর্য হইয়া গেলেন। ফকির কী করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। রাজা তাঁহার অতিথিকে প্রণাম করিলেন। অতিথি আর কেহ নহেন, রঘুপতি। রাজার প্রণাম গ্রহণ করিয়া কহিলেন, “জয় হউক।”

রাজা কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “নক্ষত্রের নিকট হইতে আসিতেছ ঠাকুর? বিশেষ কোনো সংবাদ আছে?”

রঘুপতি কহিলেন, “নক্ষত্ররায় ভালো আছেন, তাঁহার জন্য ভাবিবেন না।” আকাশের দিকে হাত তুলিয়া কহিলেন, “আমাকে জয়সিংহ তোমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছে। সে বাঁচিয়া নাই। তাহার ইচ্ছা আমি সাধন করিব, নহিলে আমার শান্তি নাই। তোমার কাছে থাকিয়া তোমার সঙ্গী হইয়া তোমার সকল কার্যে আমি যোগ দিব।”

রাজা প্রথমে রঘুপতির ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি একবার মনে করিলেন, রঘুপতি বুঝি পাগল হইয়া থাকিবেন। রাজা চুপ করিয়া রহিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, “আমি সমস্ত দেখিয়াছি, কিছুতেই সুখ নাই। হিংসা করিয়া সুখ নাই, আধিপত্য করিয়া সুখ নাই, তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ তাহাতেই সুখ। আমি তোমার পরম শত্রুতা করিয়াছি, আমি

তোমাকে হিংসা করিয়াছি, তোমাকে আমার কাছে বলি দিতে চাহিয়াছিলাম, আজ আমাকে তোমার কাছে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে আসিয়াছি।"

গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, "ঠাকুর, তুমি আমার পরম উপকার করিয়াছ, আমার শত্রু আমার ছায়ার মতো আমার সঙ্গে সঙ্গেই লিপ্ত হইয়া ছিল, তাহার হাত হইতে তুমি আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছ।"

রঘুপতি সে কথায় বড়ো একটা কান না দিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আমি জগতের রক্তপাত করিয়া যে পিশাচীকে এতকাল সেবা করিয়া আসিয়াছি সে অবশেষে আমারই হৃদয়ের সমস্ত রক্ত শোষণ করিয়া পান করিয়াছে। সেই শোণিতপিপাসী জড়তা-মূঢ়তাকে আমি দূর করিয়া আসিয়াছি, সে এখন মহারাজের রাজ্যের দেবমন্দিরে নাই; এখন সে রাজসভায় প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে চড়িয়া বসিয়াছে।"

রাজা কহিলেন, "দেবমন্দির হইতে যদি সে দূর হয় তো ক্রমে মানবের হৃদয় হইতেও দূর হইতে পারিবে।"

পশ্চাৎ হইতে একটি পরিচিত স্বর কহিল, "না মহারাজ, মানবহৃদয়ই প্রকৃত মন্দির, সেইখানেই খড়্গ শাণিত হয় এবং সেইখানেই শত সহস্র নরবলি হয়। দেবমন্দিরে তাহার সামান্য অভিনয় হয় মাত্র।"

রাজা সচকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন সহাস্য সৌম্যমূর্তি বিল্বন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "আজ আমার কী আনন্দ!"

বিল্বন কহিলেন, "মহারাজ, আপনাকে জয় করিয়াছেন বলিয়া সকলকেই জয় করিয়াছেন। তাই আজ আপনার দ্বারে শত্রুমিত্র সকলে একত্র হইয়াছে।"

ফকির অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "মহারাজ, আমিও তোমার শত্রু, আমিও তোমার হাতে ধরা দিলাম।" রঘুপতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, "এই ব্রাহ্মণঠাকুর আমাকে জানেন। আমিই সুজা, বাংলার নবাব, আমিই তোমাকে বিনা অপরাধে নির্বাসিত করিয়াছি

এবং সে পাপের শাস্তিও পাইয়াছি— আমার ভ্রাতার হিংসা আজ পথে পথে আমার অনুসরণ করিতেছে, আমার রাজ্যে আমার আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। ছদ্মবেশে আমি আর থাকিতে পারি না, তোমার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া আমি বাঁচিলাম।”

তখন রাজা ও নবাব উভয়ে কোলাকুলি করিলেন। রাজা কেবলমাত্র কহিলেন, “আমার কী সৌভাগ্য!”

রঘুপতি কহিলেন, “মহারাজ, তোমার সহিত শত্রুতা করিলেও লাভ আছে। তোমার শত্রুতা করিতে গিয়াই তোমার কাছে ধরা পড়িয়াছি, নহিলে কোনো কালে তোমাকে জানিতাম না।”

বিল্বন হাসিয়া কহিলেন, “যেমন ফাঁসের মধ্যে পড়িয়া ফাঁস ছিঁড়িতে গিয়া গলায় আরও অধিক বাধিয়া যায়।”

রঘুপতি কহিলেন, “আমার আর দুঃখ নাই, আমি শান্তি পাইয়াছি।”

বিল্বন কহিলেন, “শান্তি সুখ আপনার মধ্যেই আছে, কেবল জানিতে পাই না! ভগবান এ যেন মাটির হাঁড়িতে অমৃত রাখিয়াছেন, অমৃত আছে বলিয়া কাহারও বিশ্বাস হয় না। আঘাত লাগিয়া হাঁড়ি ভাঙিলে তবে অনেক সময়ে সুধার আস্বাদ পাই। হায় হায়, এমন জিনিসও এমন জায়গায় থাকে।”

এমন। অভ্রভেদী হো হো শব্দ উঠিল। দেখিতে দেখিতে দুর্গের মধ্যে ছোটোবড়ো নানাবিধ ছেলে আসিয়া পড়িল। রাজা বিল্বনকে কহিলেন, “এই দেখো ঠাকুর— আমার ধ্রুব।” বলিয়া ছেলেদের দেখাইয়া দিলেন।

বিল্বন কহিলেন, “যাহার প্রসাদে তুমি এতগুলি ছেলে পাইয়াছ সেও তোমাকে ভোলে নাই, তাহাকে আনিয়া দিই।” বলিয়া বাহিরে গেলেন। কিঞ্চিৎ বিলম্বে ধ্রুবকে কোলে করিয়া আনিয়া রাজার কোলে দিলেন।

রাজা তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ডাকিলেন, “ধ্রুব!”

ধ্রুব কিছুই বলিল না, গম্ভীরভাবে নীরবে রাজার কাঁধে মাথা দিয়া পড়িয়া রহিল। বহুদিন পরে প্রথম মিলনে বালকের ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে যেন একপ্রকার অস্ফুট অভিমান ও লজ্জার উদয় হইল। রাজাকে জড়াইয়া মুখ লুকাইয়া রহিল।

রাজা বলিলেন, "আর-সব হইল, কেবল নক্ষত্র আমাকে ভাই বলিল না।"

সুজা তীব্রভাবে কহিলেন, "মহারাজ, আর সকলেই অতি সহজেই ভাইয়ের মতো ব্যবহার করে, কেবল নিজের ভাই করে না।"

সুজার হৃদয় হইতে এখনো শেল উৎপাটিত হয় নাই।

উপসংহার

এইখানে বলা আবশ্যক, তিনটি বালক সুজার তিন ছদ্মবেশী কন্যা। সুজা মক্কা যাইবার উদ্দেশে চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গুরুতর বর্ষার প্রাদুর্ভাবে একখানিও জাহাজ পাইলেন না। অবশেষে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবার পথে, গোবিন্দমাণিক্যের সহিত দুর্গে দেখা হয়। কিছুদিন দুর্গে বাস করিয়া সুজা সংবাদ পাইলেন এখনো সম্রাট্-সৈন্য তাঁহাকে সন্ধান করিতেছে। গোবিন্দমাণিক্য যানাদি ও বিস্তর অনুচর-সমেত তাঁহার বন্ধু আরাকান-পতির নিকটে তাঁহাকে প্রেরণ করেন। যাইবার সময় সুজা তাঁহাকে বহুমূল্য তরবারি উপহার-স্বরূপ দান করেন।

ইতিমধ্যে রাজা রঘুপতি ও বিল্বনে মিলিয়া সমস্ত গ্রামকে যেন সচেতন করিয়া তুলিলেন। রাজার দুর্গ সমস্ত গ্রামের প্রাণ হইয়া উঠিল।

এইরূপে ছয় বৎসর কাটিয়া গেলে ছত্রমাণিক্যের মৃত্যু হইল। গোবিন্দমাণিক্যকে সিংহাসনে ফিরাইয়া লইবার জন্য ত্রিপুরা হইতে দূত আসিল।

গোবিন্দমাণিক্য প্রথমে বলিলেন, "আমি রাজ্যে ফিরিব না।"

বিল্বন কহিলেন, "সে হইবে না মহারাজ, ধর্ম যখন স্বয়ং দ্বারে আসিয়া আহ্বান করিতেছেন তখন তাঁহাকে অবহেলা করিবেন না।"

রাজা তাঁহার ছাত্রদের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমার এতদিনকার আশা অসমাপ্ত, এতদিনকার কার্য অসম্পূর্ণ রহিবে?"

বিল্বন কহিলেন, "এখানে তোমার কার্য আমি করিব।"

রাজা কহিলেন, "তুমি যদি এখানে থাক তাহা হইলে আমার সেখানকার কার্য অসম্পূর্ণ হইবে।"

বিল্বন কহিলেন, "না মহারাজ, এখন আমাকে আর তোমার আবশ্যক নাই। তুমি এখন আপনার প্রতি আপনি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পার। আমি যদি সময় পাই তো মাঝে মাঝে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।"

রাজা ধ্রুবকে সঙ্গে লইয়া রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। ধ্রুব এখন আর নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। সে বিল্বনের প্রসাদে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া শাস্ত্র-অধ্যয়নে মন দিয়াছে। রঘুপতি পুনর্বার পৌরোহিত্য গ্রহণ করিলেন। এবার মন্দিরে আসিয়া যেন মৃত জয়সিংহকে পুনর্বার জীবিতভাবে প্রাপ্ত হইলেন।

এ দিকে বিশ্বাসঘাতক আরাকান-পতি সুজাকে হত্যা করিয়া তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ করেন।

দুর্ভাগা সুজার প্রতি আরাকান-পতির নৃশংসতা স্মরণ করিয়া গোবিন্দমাণিক্য দুঃখ করিতেন। সুজার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি তরবারের বিনিময়ে বহুতর অর্থ দ্বারা কুমিল্লা নগরীতে একটি

উৎকৃষ্ট মসজিদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহা অদ্যাপি সুজা-মসজিদ বলিয়া বর্তমান আছে।

গোবিন্দমাণিক্যের যত্নে মেহেরকুল আবাদ হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণগণকে বিস্তর ভূমি তাম্রপত্রে সনন্দ লিখিয়া দান করেন। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য কুমিল্লার দক্ষিণে বাতিসা গ্রামে একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। তিনি অনেক সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, কিন্তু সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। এইজন্য অনুতাপ করিয়া ১৬৬৯ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।'

—

শেষ দুই প্যারাগ্রাফ শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ -প্রণীত
ত্রিপুরা-ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত

প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত
বিশ্বভারতী। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
মুদ্রক শ্রীমণীন্দ্রকুমার সরকার
ব্রাহ্মমিশন প্রেস। ২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা ৬
১৫'১